কানন।

(প্রথম ভাগ)

•——০ঃ০——•

"যান্তি ন্যায় প্রবৃত্তস্য তির্য্যঞ্চোহপি সহায়তাম্।
অপন্থানন্তু গচ্ছন্তং সোদরোহপি বিমুঞ্চতি॥"

মুরারি মিশ্র

শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

'বাঁকুড়া-দর্পণ' কার্য্যালয় হইতে
ডাক্তার শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
প্র ।শিত।

১ ২। পৌষ

মূল্য সমর্থ প... অসমর্থ পক্ষে ।/০ আনা।

উপহার।

পদনখর হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত আমার দেহস্থ প্রতি পরমাণু যাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী—আধি ব্যাধি পাপ তাপময় সংসারে এক্ষণে মানবীদেহে যাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, যাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি ছায়াময়ী রূপে আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে—যাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার সহিত জগতের কোন ভালবাসার তুলনা হইতে পারে না, করুণার সেই প্রকটমূর্ত্তি, নিঃস্বার্থ প্রেমের আধারভূতা পরমপূজনীয়া স্বর্গীয়া জননী দেবীর শ্রীচরণকমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত উপহার প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা।

—০:০—

'বঙ্গ জীবন' মাসিক পত্রে ও 'বাঁকুড়া-দর্পণে' যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটীর ও "সে কি ধন" নামক একটী নূতন প্রবন্ধের একত্র সমাবেশে 'কানন" প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা আজ কাল বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক পুষ্টি-সাধন হইয়াছে। সাহিত্যের এই পরিণতির দিনে, 'কাননের' ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রন্থ যে সাহিত্য জগতের বিশাল ক্ষেত্রে কোন স্থান অধিকার করিতে পারিবে, সে উচ্চ আশা আমি করি না। তবে, দীন দুঃখী অন্ধ আতুরগণের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণেও মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বিগত দুর্ভিক্ষের সময় হইতে সোণামুখী গ্রামে যে 'গরীব ভাণ্ডার' নামে একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, 'কানন' পাঠকগণ, কাননে লিখিত একটী প্রবন্ধ পাঠেও তুষ্ট হইয়া যদি উহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ভাণ্ডারটীর কার্য্য স্থায়ী করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কাননের প্রথম প্রবন্ধটী লিখিতে, আমি

'জন্ম ভূমিতে' প্রকাশিত 'মাতৃভক্তি' নামক একটী প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী উপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কাননের শেষে যে কয়েকটী আখ্যান দেওয়া হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবের হৃদয় ভূষণ 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহা আমি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সম্পাদক মহাশয় কাননের গুরুভক্তি-শীর্ষক প্রবন্ধটী এবং সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়, 'মা' প্রস্তাবটী, 'বাঁকুড়া-দর্পণ' হইতে নিজ নিজ পত্রে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ দুইটীকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত সম্পাদকদ্বয় আমার ধন্যবাদের পাত্র। 'কানন' প্রকাশ বিষয়ে, বাঁকুড়া দর্পণের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। সোণামুখী হাইস্কুলের শিক্ষক বাবু শ্রীপতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার শারীরিক অসুস্থতার সময় 'কাননের' পাণ্ডুলিপি খানি প্রস্তুত করিয়া দিয়া অনেক উপকার করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-বন্ধু ভূতপূর্ব্ব

'বঙ্গ জীবন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ সেন মহাশয়ও 'কানন' প্রকাশে আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়া অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইতি—

সোণামুখী হাইস্কুল
জেলা বাঁকুড়া
১৭ই পৌষ। ১৩০৪

শ্রীরসিকলাল দে

সূচীপত্র।

কানন

মা।

(১)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মা কি? এ কথার উত্তর নাই। জগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার সহিত তুলনা করিয়া 'মা কি' কথার উত্তর দিব। মায়ের তুলনা নাই। তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত উপমা দিবার কোন বস্তু পাওয়া অসম্ভব। যে মহাত্মা জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়াছেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী নমস্কার। স্বর্গ এত উচ্চ এবং পবিত্র স্থান, মা তদপেক্ষা উচ্চ এবং পবিত্র। মা'র সহিত তুলনা দিতে জগতে কি আছে বল, মহাভারতের যুধিষ্ঠির যক্ষ-সংবাদে, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? ধর্ম্মপুত্র বলিলেন, "মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর।"

মায়ের মাহাত্ম্য দেখাইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও কি বলিয়াছেন শুনুন,—"মাতা ও পিতাই পরম-

গুরু জানিবে। গর্ভে ধারণ ও পোষণ করা হেতু পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী। মাতৃ তুল্য গুরু ত্রিভুবনে নাই। যেমন গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, মহেশ্বর সদৃশ পূজনীয় নাই, একাদশী ব্রতের ন্যায় ব্রত এবং অনশনের তুল্য তপস্যা নাই; তদ্রূপ জগতে মাতার সমান গুরুও কেহ নাই। যেরূপ জামাতার তুল্য পাত্র নাই, কন্যাদানের ন্যায় দান নাই, ভ্রাতার ন্যায় বন্ধু যেরূপ সম্ভবে না; তদ্রূপ মাতার তুল্য গুরু দৃষ্ট হয় না। দেশের মধ্যে ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী দেশ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পত্রের মধ্যে তুলসী যেরূপ প্রধান, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন গরীয়ান, গুরুর মধ্যে মাতাও তদ্রূপ গরীয়সী। ধর্ম্মবিৎ পুত্র মাতা ও পিতাকে দর্শন করিলে, অগ্রে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর পিতৃপদে নমস্কার করিবে। সুদারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়াও পরমেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিলে, যাহার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন হয় তাহার আর কোন্ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে?” তাই বলি ভাই, এ গুরুর গুরু পরম গুরু মা’র সহিত তুলনা জগতে কোন্ বস্তুর সহিত দিব?

হিন্দুর শাস্ত্র কি উদার ভাবে পূর্ণ। হিন্দু

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কত মহৎ। নারীমাত্রেই মহাশক্তি চিন্ময়ী জগজ্জননীর অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। স্ত্রীলোক মাত্রকেই হিন্দু অতি ভক্তিচক্ষে দেখিয়া থাকেন। হিন্দুর চক্ষে সাধারণ নারী যদি এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধার পাত্রী, তবে প্রত্যক্ষ দেবীপ্রতিমা জগদ্ধাত্রীরূপিণী করুণা ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি মাতৃদেবীকে সন্তানের যে কিরূপ চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য তাহা বাক্যের অতীত।

নিরাকার ঈশ্বরকে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির স্থূলচক্ষে দেখা অসম্ভব। তাই পরমেশ্বরী কৃপা পরবশ হইয়া সাকার মূর্ত্তিতে জননীরূপে আমাদিগকে দেখা দেন। পরমেশ্বরী মাতৃরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজিতা। হায়! এ দেবীমূর্ত্তি এ মনোমোহিনী স্নেহময়ী মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও আমরা অন্য দেবদেবীর পূজার জন্য কাতরতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকি। মাতৃভক্তের নিকট আবার অন্য দেবদেবী কি? যথার্থ মাতৃভক্তের নিকট অন্য চিন্তনীয় বিষয় নাই। মাতৃভক্তের অন্য তপ জপ, ধ্যান ধারণা কিছুই নাই। মায়ের চরণতলই তাহার মহাতীর্থ। মাতৃপদ সেবাই মাতৃভক্ত সন্তানের মুক্তির উপায়।

মায়ের উপাসনা করিলে মাতৃভক্ত সন্তানের আর কোন দেবতার উপাসনা আবশ্যক করে না। মাতৃচরণ আশ্রয় করিলে মাতৃভক্ত সন্তানকে আর কোন স্থানে যাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে তাহা এই,—“ভগবতী একদিন কুমার কার্ত্তিক ও গণপতিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মাতার আদেশ অনুসারে কার্ত্তিক পৃথিবী ভ্রমণার্থ ময়ূরে চড়িয়া বাহির হইলেন। কার্ত্তিক মনে করিলেন, দাদা ইন্দুরে চড়িয়া বেশী দূর যাইতে পারিবেন না; ‘আমিই অগ্রে আসিতে পারিব। কিন্তু গজানন কোথাও না গিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী মায়ের চতুর্দ্দিকে একটীবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তি-ভরে ব্রহ্মাণ্ড রূপিণীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। কার্ত্তিকেয় যথাসময়ে ফিরিয়া আসিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ‘মা, একি দাদা যে এখানে বসিয়া আছেন! আমি ত মা তোমার আদেশ পালন করিলাম। দাদা করিলেন কৈ? ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বলিলেন বাপ কার্ত্তিকেয়! তোমার দাদা এখানে থাকিয়াই কার্য্য শেষ করিয়াছে। মাতার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ

করিয়া গজানন পৃথিবী পরিভ্রমণের কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বল দেখি উপরি উক্ত ক্ষুদ্র উপাখ্যানটীতে কি সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, মাতৃভক্ত যিনি তাঁহার অন্য উপাসনা নাই, তাঁহার অন্য তপস্যা নাই ; মুক্তি তাঁহার করতলস্থ।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মাতৃভক্তি কি সুন্দর। তাঁহার নিকট মাতা ও বিমাতা উভয়েই সমান। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভ্রাতাগণের মধ্যে যে কোন একটীর জীবন প্রার্থনা কর" যুধিষ্ঠির তখন নকুলের জীবন ভিক্ষা করিলেন। মহাবীর ভীম মহামতি তেজস্বী অর্জ্জুনের প্রাণ ভিক্ষা না করিয়া নকুলের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে ; যুধিষ্ঠিরের চক্ষে নিজ মাতা কুন্তিও যদ্রূপ বিমাতা মাদ্রীও তদ্রূপ। মাতা যেমন পুত্রবতী থাকিবেন, বিমাতাও তদ্রূপ পুত্রবতী থাকিবেন, ধর্ম্মপুত্রের ইহাই উদ্দেশ্য : ইহা কিরূপ উচ্চ অঙ্গের মাতৃভক্তি, তাহা বুঝাইয়া বলিবার নহে।

নাগরিক, মাতৃভক্তি কিরূপ তাহা প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চপাণ্ডব যেমন বুঝিয়াছিলেন, বুঝি জগতে কোন লোক তেমন বুঝিতে পারেন নাই। পঞ্চ-

পাণ্ডবের এই মাতৃভক্তি গুণেই বোধ হয় তাঁহারা মহাপরীক্ষায় জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। দুধের ছেলে লবকুশের একমাত্র সহায় ছিল তাহাদের মাতৃপদ-ধূলি। তাহা না হইলে তাঁহারা শিশু হইয়া পিতৃসমরে কি জয়ী হইতে পারেন? মায়ের চরণ-ধূলি যে সন্তানের পক্ষে রক্ষা-কবচ স্বরূপ ইহা দেখাইবার জন্যই যেন কবি উক্ত আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ আমাদের শাস্ত্রে অনেক রহিয়াছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া আর কাজ নাই। মা কি, মা যে সাকারমূর্ত্তিতে জগদ্ধাত্রীরূপিণী, মা যে সাকার মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী অন্নপূর্ণাস্বরূপা, মা যে মানবী নহে দেবী, আমরা এই বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছি।

মা অন্নপূর্ণা। যার গৃহে মাতা বিরাজমানা, তার অন্নের অভাব কি। মা যে নিজে না খাইয়া যে প্রকারেই হউক, পুত্রের আহার সংগ্রহের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। মা মঙ্গলময়ী। পুত্রের অমঙ্গল চিন্তা মা কি কখনও করিতে পারেন? সন্তান অবোধ হইলে মার স্নেহ অধিক হয়। মঙ্গলময়ী মা কখন সন্তানের অশুভাকাঙ্ক্ষিনী হইতে পারেন না। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"কুপুত্রো জায়েতে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি"। কথাটি অতি সত্য, সন্দেহ কি?

মা আনন্দময়ী মা যার গৃহে, তার আনন্দের অভাব কি? দুঃখস্রোত তাহার গৃহে আসিলেও মায়ের স্নেহগুণের আধিক্যে সে স্রোত কোথায় দূর হইয়া যায়। মা শান্তিময়ী—শান্তিরূপিণী জগদম্বা যে বিমলা শান্তি নির্ঝরিণীরূপে গৃহ মরুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অনুর্ব্বর গৃহক্ষেত্রকে সরস উর্ব্বর করিয়া থাকেন।

মা ভিন্ন কল্পতরু আর কোথায়? কল্পতরু শব্দের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে, মায়ের নিকট গিয়া দেখিতে হয়। এ কল্পতরুর নিকটে যখন যাহা চাহিবে তখন তাহাই পাইবে। গৃহরাজ্যের মহারাণী মা; গৃহের একমাত্র শ্রী, এই মা। দেহস্থ পেশী সমূহের কেন্দ্র স্থান যেরূপ হৃদপিণ্ড—মাতাও পুত্র-কন্যা বধূ পৌত্র পরিবেষ্টিত গৃহের তদ্রূপ কেন্দ্র-স্বরূপ।

এক কথায় বলিতে কি, যাহা কিছু সৎ, তাহাই মায়ে। যাহা অসৎ তাহার লেশমাত্র উহাতে নাই। স্নেহের জীবন্তভাব, করুণার প্রকট মূর্ত্তি, দয়ার পবিত্র নিস্যন্দন দেখিতে চাও, যাও মাতৃসন্নিধানে।

দিব্যচক্ষে দেখ, অথবা দেখিয়া দিব্য চক্ষু করিয়া লও ভাই !!

প্রেম-মন্দাকিনী-নীরে অবগাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ যদি, তবে ঐ মাতৃচরণে লুঠাইয়া লুঠাইয়া মাতৃপদধূলি প্রতি অঙ্গে প্রলিপ্ত কর।

মা।

(২)

মা, অন্তর্যামিনী। পুত্রের অন্তরের কথা মা যেমন জানিতে পারেন—সন্তানের ব্যথা মা যেমন বুঝিতে পারেন, জগতে এরূপ আর কেহ পারেন না। কোন্ পুত্রের দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইবে, মা তাহা বেশ জানেন; তাই যে কার্য্য যে পুত্র দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে, মা সেই কার্য্যের ভার সেই পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। আমি আমার নিজ জীবনেই বহুবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। মায়ের এ অন্তর্যামিত্ব সম্বন্ধে মহাভারতে একটী উপাখ্যান আছে তাহা বোধ করি অনেকেই বিদিত আছেন উপাখ্যানটী এই,—"কুন্তী ও গান্ধারীর

মধ্যে যে কেহ একশত আটটী স্বর্ণ বিল্বপত্র দিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতে পারিবেন—মহাদেব তাঁহারই উপর সন্তুষ্ট হইবেন। গান্ধারীর স্বর্ণ বিল্বপত্রের অভাব নাই কিন্তু কুন্তী বড় দুঃখিনী, তিনি মনোদুঃখে ম্রিয়মাণা; মাতার মনোদুঃখের কারণ যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তী অন্য কাহাকেও তাহা প্রকাশ না করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন। মাতা অন্তর্যামিনী, এখানে অর্জ্জুনের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া কুন্তী তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তাই বলিতেছি ভাই, মা অন্তর্যামিনী! মা মহাভাবময়ী! "প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।" প্রেমের এই পরম সার বস্তু মায়ের পবিত্র হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইয়া বাহিরে উথলিয়া পড়িতেছে। এই তরঙ্গে মাতৃভক্ত সন্তানের প্রাণ ডুবিয়া ডুবিয়া অপূর্ব্ব ভাবে মোহিত হইয়া দেবদুর্লভ সুধা পান করিতেছে। মা—ক্ষমাময়ী! সন্তানের সহস্র অপরাধ মাতা গ্রহণ করেন না। সন্তানের উপর মাতার অভিশাপের কথা কোথাও কখনও শুনি নাই। অবোধ হইয়া মার উপর কটুবাক্য প্রয়োগ কর—মার উপর অভিমান কর—মা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না—

অভিশাপ প্রদান করা দূরের কথা, তোমার কুমতি ফিরাইবার জন্য, তোমায় অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবেন। মায়ের মত এমন ক্ষমাময়ী জগতে কে আছেন বল!

মা—জ্যোতির্ম্ময়ী। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, মায়ের প্রতি অঙ্গে কি অতুলনীয় স্নেহের জ্যোতি—নিঃস্বার্থ ভালবাসার কি প্রাণস্নিগ্ধকর দীপ্তি প্রভাসিত হইতেছে। ঐ দেখ নয়নে কি অপূর্ব্ব শোভা—অধরে কি মোহিনী প্রভা—করদ্বয়ে কি প্রীতিময়ী জ্যোতিঃ—নখরে যেন দামিনী ভাতি; মায়ের মস্তকের কেশ হইতে পদনখর পর্য্যন্ত মহা-জ্যোতিতে ভাসমান। মা ভিন্ন আর জ্যোতির্ম্ময়ী কোথায়?

মা ত্রিনয়নী। মায়ের দুটী চক্ষু সাংসারিক কার্য্যের তত্ত্বাবধানে—সন্তানের সুখের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনে, সন্তান পালনের ও পোষণের জন্য নানা আহারীয় দ্রব্য আহরণে, অবিরত গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। মায়ের তৃতীয় চক্ষু—অর্থাৎ মানস-চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে গোবিন্দচরণে পুত্রের মঙ্গল কামনায় ন্যস্ত হইয়া আছে। তাই বলিতেছি, মায়ের চক্ষু দুটী নহে, মা আমার ত্রিনয়নী।

মা—মোহিনী। মা নাম কি মধুর, এমন প্রাণ-ভরা জগৎজোড়া নামে কে মুগ্ধ না হয়? রোগে, শোকে, বল দেখি 'মা' প্রাণ শীতল হইবে; বিপদে পড়িয়া ডাক 'মা,' প্রাণে উৎসাহ দেখা দিবে; ভয় চকিত প্রাণে মোহকারিণী শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

মা—অনন্তরূপিণী। সন্তানের সুখে মায়ের মূর্ত্তি কেমন হাস্যময়ী—সন্তানের দুঃখে মায়ের মূর্ত্তি অতি মলিনা। সন্তানের সুখ ও সন্তোষের অংশ অনুসারে মায়ের রূপেরও যেন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। মায়ের যেন নিজের সুখ নাই; সন্তানের ইষ্টানিষ্টে মায়ের ইষ্টানিষ্ট, সন্তানের রোগে যেন মায়ের রোগ—সন্তানের বিপদে যেন মায়ের বিপদ—সন্তানের সন্তাপে যেন মায়ের সন্তাপ। সন্তানে সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন অনুসারে মায়ের রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাই আমি মাকে অনন্তরূপিণী বলিতেছি।

মা—আদি গুরু। নিরাশ্রয়, শৈশব অবস্থায় যখন আমার ভেদ জ্ঞান ছিল না—যখন খেলনা বলিয়া আমি, সর্প ধরিতে যাইতাম যখন অগ্নির দাহশক্তি না জানিয়া আমি উহাতে হাত দিতে

অগ্রবর্ত্তী হইতাম—তখন বস্তুর বিভেদ জ্ঞান আমায় কে প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন? মা। পিতাকে জানিলাম মায়ের করুণায়—এটী এ বস্তু, ওটী ও বস্তু, উহা স্পর্শ করিলে হস্ত পুড়িয়া যাইবে—উহা খাইলে প্রাণ নাশ হইবে—ও দাদা ও বোন প্রভৃতি প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন কে? মা। তাই বলিতেছি মা আদি গুরু। ভীষ্ম বল, যুধিষ্ঠির বল, ভীমার্জ্জুন বল, আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রই বল—প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, ধ্রুব বল আর প্রহ্লাদই বল, সকলেই যে জগতের পূজনীয় ও আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন, তাহার মূল মায়ের করুণা। মায়ের চরণতলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন নাই—এমন কর্ম্মবীর এবং ধর্ম্মবীর জগতে কে আছে?

মাকে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কিয়দংশও বুঝিতে পারিলাম কি না সন্দেহ। এই ত মা—এই ত মায়ের স্নেহ। বল দেখি, ভাই এ হেন জননী যাঁহার গৃহে নাই—তাঁহার গৃহ কিরূপ? আমি বলি "শ্মশানমেব তদ্গৃহম্।" সংসারে যিনি বাল্য কাল হইতেই মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত তিনি অতি ভাগ্যহীন। জগতের একটী উৎকৃষ্ট সুখের আস্বাদন তিনি করিতে পান নাই। মাতৃহীন

হইলে সন্তান 'ভাগ্যহীন' বলিয়া কেন আপনাকে সম্বোধিত করে এতদিনে তাহা বুঝিতেছি। আমি আজ কিছুদিন মাতৃহীন হইয়াছি, মা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে লিঙ্গদেহে বা সূক্ষ্ম-শরীরে বিরাজমানা। বিজয়ার দিনে জাহ্নবীজলে দশভুজা মাকে বিসর্জ্জন দিয়া মনের যেরূপ অবস্থা হয়—প্রত্যক্ষ দেবীস্বরূপা স্নেহময়ী মাকে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আমার অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়। এতদিনে বুঝিতেছি মায়ের স্নেহের গভীরতা কিরূপ। নবনীত কোমল মায়ের হৃদয় যে কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিতেছি। আর সহানুভূতি-শূন্য জগতের বাহিরে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বলিতেছি—

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন ;
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন॥"

এমন মাতার চরণ সেবা না করিয়া যে পুত্র কুশিক্ষার বশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তিনি যে ধর্ম্ম জগতের বহির্দ্দেশে, তাহার আর সন্দেহ নাই। মায়ের মনে কষ্ট দিয়া—স্নেহময়ী মাকে কাঁদাইয়া যে অবোধ সন্তান পরম পদ লাভের আশায় বৃন্দাবনেও বাস করিতেছেন, তিনি মোক্ষ পদের অধিকারী হইতে

পারেন না; মায়ের চক্ষের এক বিন্দু জল শতবর্ষ-ব্যাপী তীর্থবাসের ফলকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। অদ্বৈত-গুরু মহাজ্ঞানী শঙ্কর কি মায়ের মত না লইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন? একদিকে শঙ্করের সংসার ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, অন্যদিকে স্নেহময়ী জননীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ। তিনি কি করিবেন? মাকে অসন্তুষ্ট করিলে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে, শঙ্কর ইহা বুঝিলেন; অবশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শঙ্কর নদীপার হইবার সময় নদীতে এক মায়া কুম্ভীর সৃজন করিয়া মাতাকে বলিলেন "মা যদি আমায় সংসার ত্যাগ করিতে আদেশ কর, তবেই আমার পরিত্রাণ— নচেৎ কুম্ভীরের গ্রাস হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই।" মা কি করিবেন? শঙ্করজননী পুত্রকে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। মহাজ্ঞানী ও মহাতত্ত্বদর্শী শঙ্কর নিজ জননীকে সন্তুষ্ট না করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন নাই। তোমার আমার ত দূরের কথা। উপরিউক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে— মা'র অসম্মতিতে তীর্থবাস

বিড়ম্বনা মাত্র। যে সন্তান মায়ের চরণতলকে মহা-তীর্থ জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিক মনে তাঁহার চরণ সেবা করেন— তাঁহার স্বতন্ত্র তীর্থে গমনের আবশ্যকতা নাই। সেই মাতৃভক্তের হৃদয়ই বৈকুণ্ঠধাম। অহো! কুগ্রহ আমার, প্রাণের সহিত মায়ের চরণ সেবা করিয়া এ বৈকুণ্ঠধামের অধিকারী হইতে পারিলাম না। যে দুর্ব্বিনীত পুত্র মাকে সামান্যা নারী জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করেন, তিনি সাবধান হউন।

মাকে চিন্ময়ী পরমেশ্বরী জ্ঞানে বল ভাই—
"ভক্ত্যাহং প্রণতোঽস্মি দেবী—"

মড়ার মাথা।

হে জীবিত কি ভাবিছ ক'রে নিরীক্ষণ।
সেই মোর পদ্মমুখ কেমন এখন?
আরক্তিম ওষ্ঠাধর সুধার ভাণ্ডার,
দশন মুকুতা পাঁতি কিবা দশা তার;
আসিবে এদিন তব একদিন ভাই,
'মড়ার মস্তক' ব'লে ঘৃণিবে সবাই।"

আমি এক মড়ার মাথা। লোক জগতের বহির্ভাগে এক প্রান্তে সৈকত শ্মশান-ভূমে আমি পড়িয়া

আছি। সংসারের লোকে আমাকে আর দেখিতে চাহেন না। এক্ষণে তাঁহারা আমায় নিতান্ত অপবিত্র ও অস্পর্শীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের ঘৃণার ও উপহাসের পাত্র হইয়াছি। আমি কি ছিলাম—কি হইয়াছি—সে সংবাদ সংসারী রাখিতে ইচ্ছা করেন না। আমার প্রতাপে একদিন কত লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। যে শক্তি আমাতে ছিল সে শক্তি এক্ষণে নাই—যে শক্তিতে আমি বলবান ছিলাম, আমার সে শক্তি অন্তর্হিত! তাই আমার এ পরিবর্ত্তন। কি ছিলাম—কি হইয়াছি। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

আমি এক "হাকিম—মড়ার মাথা।" শুধু মড়ার মাথা নহি; হাকিম মড়ার মাথা। সাধারণ মানবের কত উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত একটা হাকিম। সেই হাকিম লোকের শরীরের শ্রেষ্ঠস্থানে আমি অবস্থিতি করিতাম। হায়! এক্ষণে আমি কোথায়? একে ধূলায় অবলুণ্ঠিত তাহাতে আবার সর্ব্বজন ঘৃণিত ও অস্পর্শনীয়! আমায় স্পর্শ করিলেও লোকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া স্নান করিয়া থাকেন। কি পরিবর্ত্তন—কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

আমি কত উচ্চে ছিলাম,—এখন কত নীচে আসিয়া পড়িয়াছি। উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে ঠিক যেন আমার নরকে পতন হইয়াছে। একটা ক্ষুদ্র ক্রমির অথবা একটী ক্ষুদ্র তৃণের যে আদর, সংসারে আমি সে সামান্য আদরও পাই না। আমি যখন মানবদেহে হাকিমের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, যখন মাংস ও মেদে আমার কঙ্কাল জড়িত ছিল, তখন আমার প্রভাব দেখে কে?

আজ আপনার কথা কহিতে বসিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি একটীর পর আর একটী, জাগিয়া উঠিতেছে। মনে পড়িতেছে—আদালত, বসিবার সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদ, প্রজার শোণিতনিঃসৃত অজস্র অর্থের ক্ষয়ে নির্ম্মিত সেই প্রকাণ্ড আদালত গৃহ। মনে পড়িতেছে—আদালতের সেই বৃহত্তম কামরার মধ্যে মঞ্চোপরি সিংহাসন এবং চতুর্দ্দিকে উকিল ও আমলাগণের বসিবার আসন। সিংহাসনের উপর কোমল নধর-সুন্দর-কান্তি-দেহ রা বরবপু শোভা পাইত,—তদুপরে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সর্ব্বোচ্চস্থানে আমি কেমন অধিষ্ঠিত থাকিতাম।

গ্রীষ্মের উত্তাপে পাছে আমার অন্তরস্থ মেদ গরম হইয়া পড়ে, তাই গৃহাভ্যন্তরস্থ ছাদের বরগা

হইতে টানা পাখা আমায় শীতল করিবার জন্য সঞ্চালিত হইত। আমি উকিল, আসামী, পক্ষ বিপক্ষগণের কথা অতি ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া নিজ মন্তব্য (রায়) প্রকাশ করিয়া দিতাম। তাহাতে কাহারও সর্ব্বনাশ হইত, কেহ বা হাস্যমুখে গৃহে প্রতিগমন করিত।

আসামী হইয়া আসিলে আমি প্রায়ই ছাড়িতাম না। কখনও কখনও আমার রক্ত-মাংস-মেদময় শরীর অতিশয় গরম হইয়া পড়িত, ক্রোধে আমার সহচর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং সেই মুক্তার পাঁতি সদৃশ অমল ধবল দন্তগুলি স্বতঃই বিকট রব করিয়া উঠিত; আমার অগ্নিশর্ম্মা ভাব দেখিয়া লোকে "ত্রাহিমাং মধুসূদন" বলিয়া ডাকিত।

হায়! এক্ষণে আমি কোথায়? আমি যেখানে, আমি যাহাদের উপর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বিস্তার করিতাম, তাহারাও সেই স্থানে। আমি আজ যেমন অঙ্গার রাশির মধ্যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছি, আমি যাহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি ও যাহাদিগকে পশু অপেক্ষা অধম জ্ঞানে অন্যায় দণ্ড দিতাম, তাহারাও আজ সেই

অবস্থায় অবস্থিত। শ্মশানভূমিতে দেখিতেছি, মুড়ীমুড়কীর সমান দর। এখানে কিছুরই ভেদাভেদ নাই, এখানে কি জাতি গৌরব, কি ধর্ম্ম গৌরব, কি পদ গৌরব সবই সমান। এখানে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, শিক্ষিত, বীর, কাপুরুষের ভেদাভেদ নাই। শ্মশানভূমি দেখিতেছি, অদ্ভুত সাম্য সংস্থাপক।

আমি সমগ্র পৃথিবীকে করতলস্থ সামান্য পদার্থ বলিয়া ভাবিতাম। গভর্ণমেণ্টের কাছে অতুল ক্ষমতা হস্তে পাইয়া মানুষগুলাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতাম না, এবং তাহাদিগকে ছাগবলির ন্যায় বলিদান করিতাম। কিন্তু এই শ্মশান ক্ষেত্রে আমার গর্ব্ব যে চূর্ণীকৃত। আজ আমি যে স্থানে নিপতিত, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, পেস্কার, মেথর, চাপরাশী প্রভৃতি সকলেই সেই স্থানে বিলুণ্ঠিত। সকলেরই মাথার খুলি আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। আমার দম্ভ, অভিমান আজ যেমন চূর্ণীকৃত—আত্মাভিমানী, উদ্ধত প্রকৃতি সকলেরই প্রভাব ও ধৃষ্টতা তদ্রূপ প্রশমিত।

আমি কি ছিলাম—কি হইয়াছি। হায়! আমার সে সুন্দর কেশ কোথায়? বিলাসের অতুল উপকরণ

সামগ্রী—সেই বিলাতি এসেন্স কোথায় গেল? ট্রাঙ্কবোড়ের ন্যায় সেই সুন্দর টেড়ি,—যাহার জন্য আমার কত যত্ন, কত আয়াস ছিল, নিশিতে নিদ্রাকালেও যাহার সুবিন্যাসের কথা ভুলিতাম না—সেই টেড়ি—সুন্দরী কামিনীর বাঞ্ছনীয় সেই অনুপম শোভাস্পদ টেড়ি আমার এক্ষণে কোথায়?

সবই গিয়াছে—সকলই বিলীন হইয়াছে। তবে আমি কেন এ ভগ্নদেহে—এহেন হীনাবস্থায় থাকিয়া লোকের মনে ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেক করিতেছি? আমি কেন ঐ অসংখ্য বালুকারাশির সহিত মিশিয়া যাই না? না, বালুকারাশির সহিত মিশিয়া গেলে চলিবে কেন? এ সংসার যে অপূর্ব্ব শিক্ষার স্থল—বিশেষতঃ এই শ্মশানভূমি!!

এ শ্মশানে মানবদেহের কঙ্কালরাশি বিদ্যমান থাকিয়া অনবরত নীরবে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেছে। সংসারের মানব অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ, দম্ভে আত্ম-হারা, ন্যায়ধর্ম্মের অভ্যর্থনায় আস্থাহীন, উচ্চপদে আসীন হইয়াও প্রেমহীন ও হৃদয়বিহীন, বিদ্বান ও শিক্ষিত হইয়াও সাধারণের আদর্শের অনুপযোগী; এই সকল বিকৃতমস্তিষ্ক নরপিশাচকে ধর্ম্মশিক্ষাবলে বলীয়ান ও উচ্চমনা করিবার জন্য শ্মশানক্ষেত্রে

রাশি রাশি নরাস্থি বিদ্যমান। সংসারের উত্যক্ত মানব, আমার এই পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া একটুকুও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিবে, তাই আমিও বালুকারাশির সহিত মিশ্রিত না হইয়া এরূপ দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি।

আমি মড়ারমাথা। তোমরা আমায় হেয়জ্ঞান করিও না। সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে যে জ্ঞান না হইবে, আমার পানে তাকাইয়া একটীবার চিন্তা করিলে তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমার বিষয় চিন্তা করিলে তোমাদের একটা নূতন জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; তোমাদের মনে রাবণের চিতার ন্যায় যে চিন্তা অবিরত প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে। একটা নূতন আলোকপ্রভা সংসারের পাপে তাপে আঁধারময় তোমাদের ভয়াবহ হৃদয় আলোকিত করিবে। সময় সময় আমাকে দেখিয়া যাইও—তাহা হইলে তোমরা যেরূপ—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

শিক্ষালাভ করিবে, তদ্রূপ—

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।"

এই শিক্ষালাভও করিতে পারিবে।

আমি এক্ষণে লোক-সংসারের চক্ষে অপদার্থ হইলেও দেখ দেখি ঐ মহাযোগীর নিকট আমার কি আদর—কি অভ্যর্থনা!! হাড়ের মালা গলায় পরিয়া ত্রিশূল হস্তে ধ্যানস্তিমিতনেত্র হইয়া ডমরু বাজাইয়া, বম্ বম্ ডাক ছাড়িয়া—ঐ যে আত্ম-বিভোর যোগীটী 'পাগল হইয়াছেন,—উনি কে? চেন কি? উহাঁর নিকট আমার এবং পার্শ্বস্থ অস্থি কঙ্কালের বড়ই আদর—বড়ই গৌরব।

আমি তোমাদিগকে ভোলার ন্যায় "ভোলা" হইতে বলিতেছি না। আমি তোমাদিগকে সংসারে থাকিতেই বলিতেছি, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন তোমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা জানি। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ; তোমরা ইচ্ছা করিলে এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে থাকিয়াই সকল ক্রিয়া সাধন করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিতে পার। তবে তোমরা সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে এক একটীবার 'আমার স্মরণ' করিও এবং আমার বিষয় একটু চিন্তা করিও। এ সংসারে রাশি রাশি প্রলোভনের মধ্যে যখন নিতান্তই আত্মহারা হইয়া পড়িবে, তখন মনে করিবে শ্মশানের এই কাহিনী মনে করিলে—মাথার খুলি,—হাকিম মড়ার মাথা,

রাজাধিরাজ মহারাজের মাথা ; ভাবিয়া দেখিবে কি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন—কি শোচনীয় পরিণাম !!

সংসার মধ্যে অশেষ যন্ত্রণায় ও দুঃখে যখন প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে এবং "আর সহ্য হয় না" বলিয়া কর্ত্তব্যের হাল ছাড়িয়া দিবে, তখন শ্মশান-ক্ষেত্রে গিয়া একটীবার আমায় দেখিয়া আসিও এবং টুক্ টুক্ করিয়া আমায় বাজাইয়া ভাবিবে "কি ছিল কি হইয়াছে ?"

তোমাদের কোন আত্মীয় অথবা বন্ধুবান্ধব যদি প্রেমরসে অভিষিক্ত না হইয়া কাহারও উপর কঠোর পাশব অত্যাচার করে এবং মানুষকে মানুষ জ্ঞান না করিয়া পশুবৎ ব্যবহার করে, তবে সেই বিকৃতমস্তিষ্ক দয়ার পাত্র জীবটীকে যে কোন প্রকারে আমার নিকটে লইয়া আসিও ; আমি তাহার প্রাণে মনে ও হৃদয়ে এরূপ নূতন রস ঢালিয়া দিব, যাহাতে সে অনেকদিন প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিবে।"

মড়ার মাথা—আমাদিগকে অনবরত অস্ফুট ভাষায় এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমরা এরূপ মোহমত্ত যে তাহার ভাষার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একে আর করিয়া ফেলিতেছি।

কূপ-মণ্ডুকের দিব্যজ্ঞান।

"Let knowlege grow from more to more"

"The end of all knowledge is to know God"

"আমি গভীর কূপ মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। গ্রামস্থ একটী কূপই আমার আবাসস্থল ছিল। সংসারের লোক আমায় চিনে কি? আমার নাম কূপ মণ্ডুক। তোমাদের মধ্যে আমার ন্যায় প্রকৃতির লোক অনেকেই আছে এবং বুঝি দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে সুসময় বুঝিয়া আমার দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির ক্ষুদ্র কাহিনীটা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমি কে? আমি এক কূপমণ্ডুক। আমি কূপ মধ্যে বাস করিতাম এবং উহাকেই সসাগরা ধরিত্রী বলিয়া জ্ঞান করিতাম! কূপ ভিন্ন জগতে আর কোন স্থান আছে, আমার সে জ্ঞান ছিল না। আমি কূপের রাজা ছিলাম, মণ্ডূকীর কল্পনাময়—মোহময় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতাম। আমার মণ্ডূকীর রূপের গরিমায় কূপ জগতের সকল বস্তুই শ্রীহীন বলিয়া বোধ হইত। আমি আমার নিজের গুণ গরিমায় মত্ত হইয়া সকলকে হেয়জ্ঞান করিতাম

আমার রাজ্যে কাহারও অনাচার করিবার অধিকার ছিল না—কত কত ক্ষুদ্র জীব আমার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিতে আসিয়া এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এক্ষণে আমি স্থানান্তরিত হইয়াছি। আমার পূর্ব্ব মোহ দূর হইয়াছে। আমার নেশা ছুটিয়াছে। সে সাধের সুখময় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক্ষণে আমি সমুদ্রের তীরে আসিয়া পড়িয়াছি। দিগন্ত প্রসারিত ভীষণ তরঙ্গময় সমুদ্রের বিশাল ভাব দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে,—মত্ততা বিলীন হইয়াছে। আমি কিসের অহঙ্কার করিতাম,—কার রূপের মোহময় ছবি, কল্পনায় আঁকিয়া সকলকে কুৎসিত জ্ঞান করিতাম! হায়, এতদিন পরে আমার দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়াছে,—দিব্যজ্ঞান প্রস্ফুরিত হইয়াছে। যৌবনের প্রথম স্ফুরণেই আমি যে মদোদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম, এক্ষণে তাহার বিষয় মনে করিয়াও লজ্জিত হইতেছি। অহো! কোথায় বা আমার সেই ক্ষুদ্র কূপ,—আর কোথায় বা এই অনন্তবিস্তৃত অপার জলধি!!

প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। যিনি বুদ্ধিমান ও সুচতুর এবং যাঁহার চক্ষু আছে তিনি প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া মহতী শিক্ষা লাভ করেন। বিধাতা আমাকেও কুপ হইতে ঘটনাচক্রে সমুদ্রতীরে আনিয়া মদমত্ত মানবকে ইঙ্গিতে কি অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, বল দেখি? সদ্যজাত টিকটিকি শিশু নিজ আহার সংগ্রহে সমর্থ; চক্ষের সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিয়া একদিন এক মহাপুরুষ লীলাময়ের সঙ্কেত বুঝিলেন এবং বিধাতাই নিজ শিশুপুত্রের আহার সংস্থান করিবেন, এই বিশ্বাসে বলবান হইয়া তিনি সংসারের সুখ কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া জগতে নির্ভরশীলতার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। আবার ঐ এক মুসলমান সম্রাটের বিষয় ভাবিয়া দেখ না কেন।

একবিংশতিবার পরাজিত হইয়া সম্রাট তৈমুরলঙ্গ অশেষ মনোবেদনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা এক শৈলখণ্ড হইতে অপর শৈলে উঠিবার জন্য একবিংশতিবার অকৃতকার্য্য হইয়া দ্বাবিংশতিবারে কৃতকার্য্য হইল। তৈমুরলঙ্গ

প্রকৃতি রাজ্যের রহস্যময় ইঙ্গিত বুঝিয়া দ্বাবিংশ-বার সমরকন্দ জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল।

আমি যে ঘটনা-চক্রে কূপ হইতে সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়িয়াছি, অহঙ্কৃত মানবকে সুশিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা যেন এরূপ বিধান করিয়াছেন। দর্পহারী হরি যেমন দর্পচূর্ণ করিয়া আমায় দিব্য চক্ষু দিয়াছেন, আমার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে মানবেরও তদ্রূপ জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইবে, এই ভাবিয়া আমি আমার ক্ষুদ্র কাহিনী সাধারণের সমক্ষে কহিতে আসিয়াছি।

কূপ মধ্যে একখানি কাষ্ঠ মঞ্চে আমি একদিন জলকেলি করিতে ছিলাম, এমন সময় আমার মঞ্চ আন্দোলিত হইয়া উঠিল; কি কারণে আমার মঞ্চ আলোড়িত হইতেছে জানিবার জন্য মঞ্চ হইতে নামিয়া দেখিলাম, একটী পাত্র কূপ মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে। আমি পাত্রটী ধরিবার জন্য যেমন সদম্ভে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, অমনি কে উপর হইতে পাত্র সহ আমায় টানিয়া তুলিয়া লইল। পাত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া ঐ ব্যক্তি এরূপ জোরে আমায় ফেলিয়া দিল যে তাহাতেই

আমার প্রাণ সংশয়ের উপক্রম হইল। কিন্তু আমি সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

চিরপরিচিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে আসিতে প্রথমতঃ আমার কিছু চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে উদ্বেগ দূর হওয়ায় নূতন নূতন স্থান দেখিবার জন্য সহসা আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। আমি আর কূপের দিকে অগ্রসর না হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি যে কূপকে সসাগরা ধরিত্রী বলিয়া মনে করিতাম. তখন হইতে আমার সে ভ্রম উপলব্ধি হইতে লাগিল। ইহার পর আমি যতই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে লাগিলাম, ততই আমার মোহ একটু একটু অন্তর্হিত ও দর্প চূর্ণ হইতে লাগিল। আমি কত জলাভূমি দেখিলাম। কত কত সুন্দর সরোবর, কত তড়াগ, কত দীর্ঘিকা. কত কত নদনদী, কত বনপর্ব্বত. প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় কত অপরূপ দ্রব্য দর্শনে তাহাদের সহিত আমার কূপ রাজ্যের তুলনা করিয়া স্বতঃই অপ্রতিভ হইতে লাগিলাম।

আমি উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—অনন্ত আকাশ, নীল নভস্তলে অসংখ্য তারকা, বিমল

শশধর, দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক নিচয়, নীচেও অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর কত বিটপী, কত লতা, কত পুষ্প, মানবের বাসভূমি কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আধার কত প্রাসাদ দেখিয়া দেখিয়া আমি ইহাদের সহিত আমার পূর্ব্ববাসের তুলনা করিতে গিয়া আত্মহারা হইতে লাগিলাম। জড় জগতের কত আশ্চর্য্যময় বস্তু দর্শন করিয়া—জীব-জগতের কত বৈচিত্রময়ী-লীলা দর্শন করিয়া আমি বহুদিন পরে এক বিশাল সমুদ্র-তীরে আসিয়া পড়িয়াছি—যে কূপকে আমি জগৎ মনে করিতাম এবং যে কূপকে অনন্ত রত্নের আকর সুবিস্তৃত রাজ্য জ্ঞান করিয়া একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতাম, এক্ষণে আমার সে মহাভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে নিজের ক্ষুদ্রত্ব অবগত হইয়া বলিতেছি—

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আসিনু কোথায় হায়!
সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।"

আমার মনের অবস্থা আজ যেরূপ, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক রাজারও মানসিক অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে আলকি-বাইডিস নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রায়ই আপন ঐশ্বর্য্যের অভিমান করিতেন। তিনি

মনে করিতেন তাঁহার ন্যায় প্রতাপান্বিত রাজা ধরা-ধামে আর নাই;—জগতের সকল ঐশ্বর্য্য একত্র করিলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সমতুল্য হইতে পারে না। গুরু সক্রেটিস তাঁহার এই অভিমান দর্শন করিয়া এক খানি পৃথিবীর মানচিত্র লইয়া রাজার সম্মুখে ধরিলেন এবং বলিলেন—"রাজন্ এই মানচিত্রে এটিকা রাজ্য কোথায় দেখান দেখি।" রাজা প্রথমতঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে একবিন্দু পরিমিত স্থানে এটিকা রাজ্য লেখা রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। সক্রেটিস বলিলেন "সমস্ত এটিকা রাজ্য এই বিন্দু পরিমিত স্থান, বল দেখি তবে এথেন্স নগরী কত টুকু?" রাজা অপ্রতিভ হইলেন,—তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের সামান্য ঐশ্বর্য্যের মহাভিমান বিদূরিত হইল। তদবধি আল-কিবাইডিস নিজ ঐশ্বর্য্যের অভিমান করিতেন না।

আমি ইতর প্রাণী। তোমরা মানব—জীব জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। 'কূপ-মণ্ডূক' বলিয়া তোমাদের নিকট আমার একটী জাতীয় কলঙ্ক আছে। কিন্তু ভাই বুদ্ধিমান আখ্যাধারী মানব, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার অথবা আমার জাতি অপেক্ষা অধিকতর হীনপ্রকৃতি সম্পন্ন

কি না, ভাব দেখি ? আমার কলঙ্কের কথা তোমা-দিগকে আর বলিতে হইবে না,—আমি উহা নিজেই স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতেছি।

এই সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে আমি এই অল্পদিন মধ্যেই কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মানব দেখিলাম। তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াও বিকৃত মস্তিষ্ক,—বিদ্যা লাভ করিয়াও অবিদ্যার মোহে বিজড়িত। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া, বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও উচ্চরাজ-কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেই জীবনের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া পড়েন এবং জগতের তুলনায় নিজ ক্ষুদ্রত্বের বিষয় ভুলিয়া গিয়া সাধারণ মানুষগুলাকে মানুষ জ্ঞান না করিয়া সদম্ভে বিচরণ করিতে থাকেন। হায় ! আমার ন্যায় এই দয়ার পাত্র জীবগুলির মোহের নেশা কি ছুটিবে না ? ইহাঁরা যদি উপর পানে তাকাইয়া, নির্ম্মল বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া তোষামোদকারী নীচ অনুচরবর্গের চাটুকারিতায় বিমোহিত না হইয়া, ধীরভাবে শাসন-দণ্ড পরি-চালনা করেন, তবে সংসার কি সুখেরই হয়। আর তাহা হইলে আমায় কাহিনী প্রকাশ করিয়া

কষ্ট পাইতেও হয় না। ভাই ধনী, তুমিই বা কিসের অহঙ্কার করিতেছ? চক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন পরিবর্ত্তন দেখিয়া কি তোমার জ্ঞান হইতেছে না? রূপ থাকে না, সৌন্দর্য্য স্থায়ী হয় না,—জলের মত ধন কোথায় চলিয়া যায়। কত রাজ্য হইল, কত রাজ্য লোপ পাইল। দেশভ্রমণে কত বিশাল সৌধ-শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কত হীরক খচিত মণি মাণিক্য মণ্ডিত নগরে শ্মশান চিতা প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিলাম, কত রাজপ্রাসাদ শৃগাল কুক্কুরের বিচরণভূমি হইয়াছে নয়নগোচর করিলাম। তাই বলি ভাই,

"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বম্"

মহামতি নিউটন একদিন জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াইয়া সামান্য উপলখণ্ড সংগ্রহে জীবন অতিবাহিত হইল বলিয়া, বিনয়ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি বিধাতার কৃপাবলে সাগরতীরে উপনীত হইয়া অহঙ্কৃত ও অনভিজ্ঞ মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি,—

"দেখ ভাই সম্মুখে তোমায় ভৈরব তরঙ্গময় বিশাল সাগর। হা স্বার্থকূপমগ্ন নর! তোমরা আমার কথা কেহ শুনিবে কি? কেহ বুঝিবে কি?

চোখ্ গেল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন সংসার-কাননে প্রবেশ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, পথহারা পথিকের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলাম মাত্র। সংসারের নানাপ্রকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কখনও স্তম্ভিত, কখনও বিস্মিত এবং কখনও হতাশ ও অবসন্ন হইতেছিলাম। একদিন এক উপবনে কে মধুর রবে বাতাসের মধ্যে লহরীলীলা ছুটাইয়া ডাকিয়া উঠিল,—"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল"।

ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম একটী পাখী থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বলিতেছে,—"চোখ্ গেল"। যতই গভীর দুঃখে পতিত হওয়া যাক্ না কেন, যদি সে দুঃখের সময় একজন সমদুঃখভাগী মিলে, তবে যেন সে দুঃখের মধ্যেও নিরাশার অবসাদ-ছায়ার অভ্যন্তরে একটুকু উল্লাসের বিদ্যুৎপ্রভা চমকিয়া উঠে। সংসারের কণ্টকময় স্থানে পড়িয়া, আমার যখন পাদদেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ঠিক সেই সময় মনের মত এক বন্ধু পাইয়া আমি যেন এক অতি মধুর আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। আমার প্রাণের মধ্য হইতেও সহসা কে যেন বলিয়া

উঠিল,—"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল"। যথার্থ বটে; ঐ ক্ষুদ্র পাখী ঠিকই বুঝিয়াছে, অন্যে এতদিন আমার প্রাণের গভীর বেদনা বুঝিতে পারে নাই; তির্য্যক্-যোনিতে জন্ম হইলেও ঐ ক্ষুদ্র ইতর প্রাণী আমার হৃদয় অভ্যন্তরস্থ গভীর ব্যথা,—আমার অব্যক্ত যাতনাসূচক মনের কথা,—ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছে। যেদিন হইতে পাখীর ঐ "চোখ্ গেল" রব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, আমি সেই দিন হইতে পাখীটিকে ভাল বাসিয়াছি। সেই দিন হইতে ঐ ক্ষুদ্র পাখী আমার হৃদয়ে একটা স্থান অধিকার করিয়াছে। পাখীর সহিত যদিও আমার এইক্ষণে সাক্ষাৎ হয় না, তথাপি তাহার ছায়া যেন আমার প্রাণের সহিত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সে ছায়া সহজে মিশিবার নহে।

আমার "বিবেক" পাখীর সহিত ঐ কাননের পাখী মিশিয়া গিয়া যেন থাকিয়া থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রের—প্রতিপাদক্ষেপে রব তুলিতেছে—"চোখ গেল"।

যখন সংসারে দেখিতে পাই কপট বন্ধুর অভাব নাই, একজন অপরের সহিত অলীক বন্ধুত্ব

দেখাইয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিস্কার করিয়া শত্রুর অধিক কার্য্য করিতেছে, তখনই মনে পড়ে,—পাখীর সেই মধুর কাকলী "চোখ গেল"।

সংসারে যখন দেখি 'বঙ্গবধূ' আর গৃহ লক্ষ্মী না থাকিয়া পটের বিবি হইয়া অলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন—এবং শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতৃ মাতৃরূপ জ্ঞান না করিয়া তাঁহাদের সহিত দাস দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, তখন মনো দুঃখেই বলিতে হয়, "চোখ গেল"।

বঙ্গদেশে যখন দেখি পৌরাণিক পুত্র হইয়া নিজ স্নেহময়ী প্রত্যক্ষ দেবী প্রতিমা মাতাঠাকুরাণীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছেন এবং পরমপূজ্য পিতৃদেবের প্রতিও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অসন্তোষের কারণ হইয়া কুলাঙ্গার নামে অভিহিত হইতেছেন, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতে হয়,—"চোখ-গেল"।

যখন দেখিতে পাই, সংসারে মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা অধিকাংশ স্থলেই অর্থেরই উপর স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন মনো-মধ্যে আসিয়া উঠে "চোখ গেল"।

যখন দেখি—দেশের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ও

বিচারক হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি পক্ষপাতিতা প্রদর্শনে নিজ সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা অতিরিক্ত তোষামোদপ্রিয়তায় অন্ধ হইয়া ন্যায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি ও প্রজারঞ্জনের পরিবর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া সরকারে নিজ প্রতিপত্তি (Prestige) বজায় রাখিতে যত্ন করিতেছেন তখন হাহাকারে বলিতে হয়—"চোখ গেল"।

যখন দেখি বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে, প্রতিপল্লীতে, একজনের সহিত অপর ব্যক্তির বিশেষ সদ্ভাব নাই, প্রত্যুত ঈর্ষা ও হিংসার দাবানল অতি তীব্রভাবে পরস্পরের মনোমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীর উৎসন্ন যাইবার পথ পরিস্কার করিয়া তুলিতেছে, তখন অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, এবং গভীর আর্ত্তনাদে বলিতে হয়—"চোখ গেল"।

যখন দেখি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক এক ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে আসীন হইয়া ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন এবং মনুষ্য হইয়া নারায়ণের

পদাঘাত করিয়া প্লীহা ফাটাইয়া দিতেছেন, তখন এ পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় এবং অসহ্য যাতনা সহকারে বলিতে হয়, আর দেখিতে পারি না—"চোখ্ গেল"।

এইরূপ দুঃখের কথা কত বলিব। সংসারে দিন দিন এইরূপ কত দৃশ্য দেখিতেছি,—দেখিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি, আর অশ্রু জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়া উঠিতেছি—"চোখ্ গেল।" মানুষ খুব বুদ্ধিমান, বিবেচক এবং লোকচরিত্রজ্ঞ তাহা স্বীকার করি, কিন্তু "চোখ গেল" পাখীর এই চোখ গেল কথটীর ভিতরে আমি যে শিক্ষা এবং যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহাতে ঐ পাখীটীকে মানব হইতে উচ্চস্থান দিতে আমার সময়ে সময়ে সাধ হয়। বলিহারি পাখী, পাখী ঠিক বুঝিয়াই বলিয়াছিল "চোখ গেল।" সংসার-ক্ষেত্রে যত দিন থাকিব, তত দিন বুঝি বলিতে হইবে "চোখ গেল"—তত দিনই বুঝি শুনিতে হইবে "চোখ গেল।" বুঝিয়া লও ভাই আমার এই "চোখ গেল" দেখিয়া তোমাদের চোখ যায় কি না? বিধাতা হে, কবে "চোখ গেল" ঘুচিয়া স্বর্গীয় আলোকে চোখ ঠাণ্ডা হইবে, বলিয়া দাও। প্রভো! সে দিন কি হইবে? এ সংসার যে সং—সার।

স্বর্গের আলোক কি এস্থলে বিভাসিত হইবে? আকাশ কুসুম, অহো অলীক কল্পনা!!

মায়া।

সংসারের চারি ধারে কেবল মায়ার খেলা। সংসারী-জীব কেবল মায়ার টানে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। লোক মায়ার ঘোরে মত্ত হইয়া অনিত্য-সুখকে আলিঙ্গন করিয়াছে, চৈতন্যের নিত্য-প্রীতি নিকেতন বিস্মৃত হইয়াছে। মায়ায় অন্ধ হইয়া মানুষ আপনাকে চিনিতে অক্ষম—মানুষ শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া "প্রেয়ের" অন্বেষণে উন্মত্ত।

এই মায়া হইতেই সংসারে আসক্তি এবং বাসনার উদ্ভব হয়। বাসনাই সকল অশান্তির মূল। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মনুষ্য সমাজে অবস্থান করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আহার, বসন ভূষণ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন; সেই সকল বস্তু প্রাপ্তির জন্য কামনার উদ্রেক না হইলে সংসার থাকে কেমন করিয়া? কিন্তু বাসনা আমাদের বশ না হইয়া আমরা বাসনার

দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি ; তজ্জন্য বাসনার তীব্র অনলে পড়িয়া আমরা অহরহ দগ্ধ হইতেছি।

এ বিশ্ব-সংসার মায়া ও চৈতন্য জড়িত না হইলে সংসারের কার্য্য হয় না সত্য বটে ; তবে যেখানে মায়া, চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে স্থানে জীবের দুঃখ—আর যেখানে চৈতন্য মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়াও নিজ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, সে স্থানে জীবের শান্তি, সুখ, প্রীতি ও আনন্দ।

কোন কবি বলিয়াছেন, "যিনি বাসনা জয় করিয়াছেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি, বাসনা জয়ীই প্রকৃত জয়ী ; নেপোলিয়ান বল, সিজার বল, সকলের উপর তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত।" আবার সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা কার্লাইল বলেন, "The fraction of life can be increased in Value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator ... ... Unity itself divided by zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the world under thy feet &" অর্থাৎ এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে যেমন অনন্ত হয়, তদ্রূপ সুখ-সমষ্টিরূপ লবকে বাসনারূপ হর দিয়া ভাগ করিবার

সময় বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে, ভাগফলরূপ সুখ ততই বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ বাসনারূপ হরকে যদি শূন্যে পরিণত করিতে পার, তবে সুখও তোমার অনন্ত হইবে।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী।

জীব যে বস্তুতে যে পরিমাণে আসক্ত, সে বস্তু পাইবার জন্য অথবা সে বস্তুকে দেখিবার জন্য তাহার তত আকাঙ্ক্ষা বা লালসা জন্মে। পয়ঃপ্রণালীর কীট যেরূপ সুধাহ্রদে নিহিত হইলেও, আপনাকে তৃপ্ত বোধ করে না অথবা শিশু যেরূপ দুগ্ধ ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে কৃমি বিবর্দ্ধক শর্করার প্রতি আসক্ত হয়, তদ্রূপ আপাত-মধুর সংসারের সুখকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়া মানুষ তাহারই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নির তেজ হ্রাস না হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হয়,

ভাবময় হইতে হইলে জীবকে স্ব-ভাবে আসিতে হইবে,—

জীবকে মায়ার পাশ ছেদন করিয়া প্রকৃত প্রেম-পাশে বদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির এরূপ অনুগত যে, তাহার নিকট স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত হইলেও তাহার দিকে না তাকাইয়া সে প্রবৃত্তির সদ্যঃপ্রীতিকর-পার্থিব বস্তুর দিকেই প্রধাবিত হয়। তখন গরলই তাহার চক্ষে অমৃত, পয়ঃপ্রণালীর ঘৃণিত পূতি-গন্ধি বারিই তাহার পক্ষে গঙ্গোদক। জীব মায়ার নেশায় অন্ধ হইলে, পার্থিব [illegible] তাহাকে কত হীনপথে লইয়া যায়,—তদ্বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান বর্ণন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপাখ্যানটী এই,—

উত্তর ভারতের কোন পল্লীতে [illegible] বণিক বাস করিতেন। বণিকের পত্নী ও দুইটী পুত্র ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের বয়স ৮ বৎসর এবং অপরের বয়স [illegible] বৎসর। একটী মিষ্টান্নের দোকান হইতে তাঁহার সংসার চলিত। খরচ বাদে যাহা কিছু থাকিত, বণিক তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। এ বিষয় তাঁহার পত্নী অথবা পুত্র জানিত না। এক দিন বণিক নিজ বিপণিতে

বসিয়া আছেন; এমত সময়ে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বণিক দ্বিরুক্তি না করিয়া যথাস্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

জলযোগাদি শেষ হইলে সন্ন্যাসী বণিকের নিকট শতধা-ছিন্ন বস্ত্র খানি সংস্কার করিবার জন্য একটু সূতা ও একটী সূঁচ চাহিলেন। বণিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সন্ন্যাসী বণিকের নিকট বিদায় লইতে আসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সদ্ব্যবহারে অতি তুষ্ট হইয়াছি; কারণ তুমি আমায় আশ্রয় দিয়া যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমি কখনই ভুলিব না; তোমার প্রত্যুপকার করি, এরূপ সাধ্য আমার কি আছে? কেন না আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী-সন্ন্যাসী মাত্র। তবে যদি তুমি কোন অপার্থিব সামগ্রী পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা দিয়া আমি সুখী হই।"

বণিক বলিলেন, "বাবাজী! আপনি সাধু পুরুষ, আমায় দয়া করিয়া যাহা দিবেন দিন।"

সন্ন্যাসী। "ঈশ্বর কৃপায় আমার, এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা গোলোকের নিত্য সুখ আমি

তোমায় প্রদান করিতে পারি, তুমি স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাবে কি ?

বণিক এই কথা শুনিয়া ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন ; পরে বলিলেন "ঠাকুর! স্বর্গ-সুখ কামনা কে না করে ? স্বর্গরাজ্যে রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? কিন্তু মহাশয় ! আমার পুত্রদ্বয় নিতান্ত শিশু, তাহাদের এ অবস্থায় রাখিয়া আমি আপনার সহিত কি রূপে যাইব ? যদি আমার উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ থাকে, তবে কিছু দিন পরে আসিবেন ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আচ্ছা আমি ৮ বৎসর পরে আসিব।" দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। সন্ন্যাসী, যথাসময়ে বণিকের নিকট পুনঃ দেখা দিলেন। বণিক বলিলেন, "মহাশয় ! দুঃখের কথা বলিব কি, আমার পুত্রদ্বয় অসৎ সংসর্গে মিশিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল, তাহাদের বিবাহ দিলে সৎপথে আসিতে পারে বলিয়া তাহাদের বিবাহ দিতে মানস করিয়াছি ; আপনি —"

সন্ন্যাসী কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি আর ৮ বৎসর পরে আসিব, তুমি প্রস্তুত থাকিও।"

৮ বৎসর অতীত হইল; সন্ন্যাসী আবার বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন কিন্তু দেখিলেন, বণিক গৃহে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট বণিকের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইলেন এবং যোগবলে জানিলেন বণিক বলদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত জমি কর্ষণ করিবার জন্য ক্ষেত্রে গিয়াছে। কিছু ক্ষণ পরে বলদ গৃহে আসিল। সন্ন্যাসী সুবিধা বুঝিয়া গোশালায় বলদের নিকট গিয়া নিজ কমণ্ডলু হইতে তাহার গাত্রে বারি সিঞ্চন করিলেন। বারির গুণ অপূর্ব্ব; সলিলের গুণে বলদের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন "তবে আমার সহিত চল।"

বলদ বলিল আমার পুত্রদ্বয়ের অবস্থা দেখিতেছেন ত? আমি তাহাদের পরিত্যাগ করিলে তাহারা অনাহারেই মরিবে, আমি এখনও সাধ্যমত তাহাদের কার্য্য করিতেছি; আর কিছু দিন পরে আপনার সঙ্গে যাইব।

সন্ন্যাসী "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে পুনরায় ৮ বৎসর গত হইল। সন্ন্যাসী বণিকের গৃহদ্বারে একটী কুকুর রহিয়াছে, দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী যোগবলে জানিলেন, " এ কুকুর আর কেহ নয়—সেই বণিক, "এখনও মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই" কুকুরের গায়ে সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ বারি সিঞ্চন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এবার চল।"

কুকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, " মহাশয়! পল্লীতে চোরের যে উপদ্রব, তাহাতে আমি পাহারা না দিলে দস্যুরা আমার পুত্রদ্বয়ের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যাইবে; আপনি আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন।"

কুকুররূপী বণিকের ঘোর আসক্তির বিষয় সন্ন্যাসী বুঝিলেন, কিন্তু কিছু মাত্র বিরক্ত হইলেন না। বলিলেন, " আচ্ছা আমি ৮ বৎসর পরে আবার আসিব।"

কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। সন্ন্যাসী এবার আসিয়া দেখিলেন, পুত্র-দ্বয় আর এক অন্নে নাই। তাহারা "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া অতি ক্লেশে কালযাপন করি-তেছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুত্রদ্বয় বলিল, "এই সন্ন্যাসীই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, এ লোকটা যে দিন হইতে আমাদের ঘরে আসিতেছে, সেই দিন হইতে আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে।"

সন্ন্যাসী বুঝিলেন "পুত্রদ্বয়ের অর্থাভাবে মতিভ্রম

ঘটিয়াছে”; তিনি বলিলেন “তোমাদের যদি এত দূর অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত, তবে এক কাজ কর, গৃহের দক্ষিণ কোণে এক গর্ত্তে কতকগুলি টাকা আছে, তোমরা উভয়ে তাহা বিভাগ করিয়া লও।” সন্ন্যাসীর কথানুসারে গর্ত্তের নিকট গিয়া পুত্রদ্বয় দেখিল এক “ভীষণ সর্প।” পুত্রদ্বয় একে সন্ন্যাসীর উপর বিরক্ত; তদুপরি এই ঘটনা। তাহারা রাগে কাঁপিতে লাগিল এবং বলিল “ওহে ঠাকুর তুমি আমাদের প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছ—দেখ দেখি গুহার নিকট কি?” এ সর্প অন্য কেহ নয় কুকুররূপী বণিক এক্ষণে সর্প মূর্ত্তিতে নিজ পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন রক্ষা করিতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন “আচ্ছা তোমরা সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখ গুহার ভিতর এক কলসী দেখিতে পাইবে।” পুত্রদ্বয় সর্পকে নিহত করিয়া কলসী উত্তোলন করিল। সন্ন্যাসী, এই অর্থ বিভাগ করিয়া লইবার জন্য, উভয়কে বলিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় সন্ন্যাসী সর্পের মৃত আত্মা লইয়া গিয়া এক বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে দেখিলেন, “এক রাজা ও রাণী পুত্রকামেচ্ছু হইয়া সন্ন্যাসীর অপেক্ষা করিতেছেন।” আমরা এই স্থানেই আমাদের উপা-

খ্যান শেষ করিলাম। যদিও উপরিলিখিত বিষয়টী একজন সাধু কর্ত্তৃক কথিত গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি উহাতে আমাদের শিখিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। জীব কিরূপ মায়ার দাস—আসক্তির অনুগত, তাহা আমরা দৈনন্দিন ঘটনা হইতে জানিতে পারি। পাঠক এই গল্পের সহিত তাহা মিলাইয়া লইবেন।

মায়ার বলে, আসক্তির উত্তেজনায়, বাসনার তীব্র অঙ্গুলী সন্তাড়নে জীব মোহিত হইয়া সম্মুখে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কিরূপ অধোগামী হয়, উপরি উক্ত ঘটনা হইতে তাহা বুঝিলেন কি? মায়ার কি অদ্ভুত কার্য্য! এই মায়াই চরাচর বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিসর্পিত রহিয়াছে। চৈতন্য এই মায়া-মেঘে আবৃত—নিজ শক্তি বিকাশে অসমর্থ। অনন্ত-লীলাময়ীর এ মায়া রহস্য ভেদ করা—অসীম-শক্তি-রূপিণীর সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া, সীমাবদ্ধ জীবের অসাধ্য ব্যাপ্যার। জ্ঞানী,—এ প্রহেলিকা বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া, করুণাময়ীর করুণা ভিখারী হইয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

ভূষণ।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দেবতার বাঞ্ছনীয় ধন, মানবের হৃদয় ভূষণ। স্বর্ণের আভরণে শরীরের শোভা বৃদ্ধি হয়—ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ভূষণে ভূষিত হইলে মানস-ক্ষেত্র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। মানসিক সে সুষমার অতুলনীয়া প্রতিভা নয়নে ও শরীরের প্রতি অংশে প্রকটিত দেখা যায়।

যে স্থানে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আবির্ভাব—সে স্থান শান্তির নিত্য লীলা-নিকেতন। প্রেমের ঘরে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার জন্ম। প্রেমের যমজ কন্যা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, তাই, দেব-পরিবার গঠনের সুন্দর উপায়। উহাদের অভাবই সংসার-বিশৃঙ্খলতার হেতু। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অভাবে গৃহ মধ্য হইতে শান্তি দূর হইয়া যায়, সুবিধা ও সময় বুঝিয়া বিরোধ-ভাব আসিয়া নিজ প্রভাব বিস্তার করে। শেষে কত সাধের প্রণয়-শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে, কত সুন্দর স্নেহ-বন্ধন অকালে ছিন্ন হইতে দেখা যায়। পরি-বারের পক্ষে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার অভাব অতি ‍দুর্লক্ষণ। ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইতে হইলে পরস্পর এক

একটু স্বার্থত্যাগ চাই। নিজের সুখের দিকেই দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। স্বার্থত্যাগ হইলেই গৃহে শান্তি নির্ঝরিণী তর তর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। যে পরিবারে সহিষ্ণুতার আবির্ভাব হইয়া থাকে, যে পরিবারের মধ্যে ক্ষমার বিমল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়,—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই প্রবাদ বাক্যের যাথার্থ্য শীঘ্র সেই পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত সহিষ্ণুতার আদর্শ পুরুষ। এতদ্ভিন্ন ভাগবতে এই সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা শিক্ষার জন্য আর একটী অতি মনোহর আখ্যান আছে, সেটীকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা এ সংসার-পথে চলিতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের সংসারে নারকীয় বীভৎস দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়া মর্ম্ম পীড়িত হইতে হয় না। পাঠক-বর্গের জন্য আমরা সেই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটী সঙ্কলিত করিতেছি।

একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণে কে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন লইয়া ঋষিগণের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত। মহামুনি ভৃগু এই বিষয় পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন। অভিবাদনাদি কিছুই করিলেন না; পুত্রের এই

ধৃষ্টতা দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু স্বীয় পুত্রের "প্রথম অপরাধ" জানিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

অতঃপর ভৃগুমুনি কৈলাসে মহাদেবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন; ভৃগুকে দেখিয়া মহাদেব উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেন। শ্মশান-বাসী শিব অশুচি জ্ঞানে মুনি তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। মুনির এই ভাব দেখিয়া মহাদেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া ভৃগুকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে এ রুদ্রমূর্ত্তি দূর হইল—মুনি ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। ইহার পর ঋষিবর বৈকুণ্ঠধামে বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর নিকট গিয়া কোন কথা না বলিয়াই, ক্রোধ সন্ধুক্ষিত মূর্ত্তিতে একবারে বিষ্ণুর বক্ষঃদেশে পদাঘাত করিলেন। নারায়ণের পার্শ্বে লক্ষ্মী এই দৃশ্য দেখিয়া নীরব রহিলেন। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার অবতার বিষ্ণু কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, পরন্তু বলিয়া উঠিলেন "মহাত্মন্ আপনার পাদদেশে কোন আঘাত লাগে নাই ত, আপনার আগমন না জানিয়াই অভিবাদনে ক্রটি হইয়াছে-ক্ষমা করুন; হে,

ভগবন্ ! আজ আমার কি সৌভাগ্য, পাদোদক দ্বারা আপনি আমায় পবিত্র করুন, অদ্য হইতে আমি আপনার পদচিহ্ন বক্ষস্থলে ধারণ করিলাম"। স্ত্রীর সম্মুখে—বিনা অপরাধে এই পদাঘাত, অথচ কমলাপতি বিষ্ণুর এ বিনীত ভাব—এরূপ ক্ষমা—এ হেন সহিষ্ণুতা!! হিন্দুর দেবতা ভিন্ন এ সহিষ্ণুতা কে দেখাইতে পারে? ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণে যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনির তদ্বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হইল। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের পালনের ভার যাঁহার উপর, এরূপ সহিষ্ণুতা তাঁহার না হইলে চলে কই ?

সূর্য্যমুখী ফুল যেরূপ ঝড়, বৃষ্টি সহ্য করিয়া কি যেন কি স্বর্গীয় করুণা পাইবার আশায় অটল ভাবে আকাশের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এস ভাই সংসারী, আমরাও তদ্রূপ অসহিষ্ণুকে পদদলিত করিয়া বিবিধ আপদ বিপদ শোক তাপের মধ্যে এবং নানা প্রকৃতির লোক দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও ক্ষমা সহিষ্ণুতার আধার স্বরূপ নারায়ণের বক্ষস্থিত ভৃগু পদচিহ্ন স্মরণ করিতে করিতে সংসারের কঠোর কর্ম্মপথে অগ্রসর হই।

সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাই আদর্শ সংসারী হইবার শ্রেষ্ঠ ভূষণ! এই অমূল্য ভূষণ অতি যত্নের সহিত

হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয় ! !

নন্দন কানন।

অমরাবতীর নন্দনকাননের কথা শুনিতে পাই। স্বর্গ কখনও দেখি নাই, স্বর্গের সুখ কি প্রকার তাহাও কখন উপলব্ধি করি নাই। শুনিতে পাই স্বর্গ এক মহাসুখের স্থান ; সে দেবদেশে দুঃখ নাই শোক নাই—সেখানে অনন্ত সুখ বিরাজিত।

স্বর্গরাজ্যের নন্দনকাননে পারিজাত ফুটে—মন্দাকিনী কল প্রবাহে সুখ সমীরণের স্পর্শে প্রেম তরঙ্গের বিপুল উচ্ছ্বাস লইয়া প্রবাহিতা হয়। শুনিতে পাই নন্দনের শোভা অতুলনীয়া—নন্দন উপবনের সে সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের মর্ত্ত্য-ধামের কোন সৌন্দর্য্যই সমকক্ষ হইতে পারে না। সে কাননে দেব শিশু দেব বালাগণ বিচরণ করেন শচীপতি নিজ কামিনী সহ তথায় বিরাজ করেন।

দুঃখ নাই—নিরাশা নাই—কপটতা নাই ; সে স্থান ভ্রমণের উপযুক্ত স্থানই ত বটে। কিন্তু সে স্থান আমাদের ন্যায় কৃমি কীটের দুরবগম্য।

কোথায় কোন্ মণ্ডলের উপর—কোন শূন্যময় প্রদেশে সে মনোহর দেবদেশ—কল্পনা বলেও তাহা অনুভব করা যায় না।

পুরাণ-বর্ণিত নন্দন-কানন যখন আমাদের অননুভব্য—সে স্থানের সুখ ভোগ যখন আমাদের সাধ্যাতীত, তখন সে দেশের কথা আলোচনা বা আন্দোলন ত অনধিকারচর্চ্চার মত বোধ হয়। তবে এই মর্ত্ত্যভূমিতে—আমাদের এই বাসভূমি পৃথিবীতে কি তদ্রূপ কোন স্থান নাই? এই পৃথিবীর মধ্যে—এই ক্ষুদ্র জীবনেই কি এমন কোন স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহার সৌন্দর্য্য 'নন্দনে'র সৌন্দর্য্যের ন্যায় অপরিসীম—যাহার সুখ নিরবচ্ছিন্ন!!

পৃথিবীর অনেক স্থানেই সুরচিত কানন দেখিতে পাই—সে কাননে ভ্রমণ করিয়া ত অনেকবারই সুখ ভোগ করিয়াছি—কিন্তু ভ্রমণ-জনিত সে সুখে আত্মার ত পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। ফুল ফল সমন্বিত—নব কিশলয় সুশোভিত পার্থিব কাননের সুখ ত ক্ষণজাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থূল দৃষ্টি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেও, অন্তর্দৃষ্টি সকল সময়ে তাহাতে প্রবোধ মানে না। তবে কি চিরসুখের

আধার-ভূমি—চিরামৃত-নিস্যন্দিনী-বিধৌত অনাবিল-সুখ-শান্তি পূর্ণ, শোক-দুঃখ-বিবর্জ্জিত স্থান এখানে নাই? আছে, দেহের ভিতর অন্বেষণ করিয়া দেখ—আছে!! ধার্ম্মিকের হৃদয়ই ত সেই "নন্দনকানন।" ইচ্ছা ও যত্ন করিলে সকলেই এ কাননের অতুল অনাবিল সুখ উপভোগ করিতে পারেন।

জগদীশ্বর আমাদিগকে নন্দন কাননের উপযোগী উপকরণ সমূহ দিয়াছেন,—আমরা যদি নিজ নিজ যত্নে কানন রচনা না করি, তবে তাঁহার দোষ কি? চক্ষু থাকিতেও চক্ষুদ্বয় মুঁদিত করিয়া থাকিলে কি দর্শন-সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়? আমরা যদি প্রতিদিন হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ করি—তবে সংসারের জঞ্জাল সমূহ হৃদয় প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিতে পারে না। হৃদয়-ক্ষেত্র উত্তমরূপে চাস করিলেই ত তাহা ফল ফুলে সুশোভিত অপূর্ব্ব উদ্যানরূপে পরিণত হইতে পারে। সুন্দররূপে কর্ষিত হইলেই ত হৃদয়-কানন, নন্দন-কানন হয়।

প্রজ্ঞা ও বিনয়কে হলযন্ত্রের অঙ্গ, মনকে চালন রজ্জু, পরিশ্রমকে বৃষ স্বরূপ এবং একাগ্র উৎসাহকে কষাঘাত করিয়া বিশাল হলদণ্ড চালনা করিলে

হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে মোহ-কণ্টক উৎপাটিত হইবে। তৎপরে প্রেম-বারিতে হৃদয় অভিষিক্ত করিয়া তাহাতে বিশ্বাসের বীজ রোপণ করিলে যে ভক্তি তরু উৎপন্ন হইবে, তাহাই নন্দনের তরুরূপে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিবে। সেই তরু কুসুমিত হইলে সকল সৌন্দর্য্যই তাহার নিকট পরাভূত হইবে।

সত্য, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার পবিত্রতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি, সুন্দর ফুল ফলে যখন তোমার হৃদয়-জাত তরুর শোভা হইবে তখনই তুমি দেখিতে পাইবে শুধু আনন্দময়,—জ্ঞান, রক্ষকরূপে নিযুক্ত না হইলে শত্রুগণ এ উদ্যানের অনিষ্টপাত করিতে পারে ; তাই জ্ঞানকে তোমার উদ্যানের রক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, আবার চারিদিকে বিবেকের বেষ্টন করিলে কোন শত্রুই বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। নিঃশত্রু ও বিঘ্নহীন হইয়া তখন তুমি বলিতে থাকিবে—

নন্দন-কানন কোথা আর ?
নন্দন-কানন, এই সুখময় হৃদাগার ॥
(হেথা) বিশ্বাসের বীজে তরু, কেমন হ'য়েছে চারু,
সাধনের কিবা কারু, বুঝিবে কে সাধ্য কার ?

প্রেম মন্দাকিনী ছুটে, জ্ঞান জ্যোতি রহে ফুটে ;
প্রবোধ সন্তোষ বালা,—কহিতেছে কথা সার ॥
বিবেক বেষ্টনে হৃদি, ঘেরা আছে নিরবধি,
শত্রু কোন আসে যদি,—জ্ঞান হরে প্রাণ তার।
ষড়রিপু অতিদূরে, ভয়ে ভয়ে উঁকি মারে,
ভিতরে আসিতে নারে, দুঃখে ছাড়ে হুহুঙ্কার

বিশ্বাসের আশ্বাস বাণী।

(১)

"এস, আমার হাত ধরিয়া এস, উদ্‌ভ্রান্ত পথিক মানব আমার হাত ধরিয়া এস। আমি তোমায় গন্তব্য পথে লইয়া যাইব—আত্মার অভীপ্সিত স্থানে লইয়া পঁহুছাইয়া দিব—আমার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর!! আমি বিশ্বাস, দেব দেব মহাদেবের দূত আমি। আমার এক হস্তে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা অপর হস্তে শাণিত অসি; এই দীপ-বর্ত্তিকার আলোকবিভায় সংশয়ের ঘোর অন্ধকার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়,—পথভ্রষ্ট দীনাত্ম পথিক অন্ধকারের গভীর আবর্ত্তে পড়িয়াও নিজ সুগম পথ অন্বেষণ করিয়া লইতে পারে—আমার হস্তস্থিত

অসির নিকট প্রবল পরাক্রান্ত মহাশত্রুও আসিতে সঙ্কুচিত হয়, তাই বলি আমার হাত ধরিয়া এস—যদি নিজ অভীষ্টস্থানে যাইতে বাসনা করিতেছ। আমার হাত ধরিয়া চলিলে বক্রপথে যাইতে হইবে না—সরল সোজা পথই আমার অবলম্বনীয়।

ভয় নাই, ভাবনা নাই, এস, যুক্তি-তর্ক, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের স্বভাবজ সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া এস, এই সংসারের পথে প্রতি পাদক্ষেপে শত শত কণ্টক আস্তীর্ণ—দারুণ রিপুকুল শ্মশানের রক্ত মাংস লোলুপ উলঙ্গ পিশাচগণের ন্যায় সদন্তে করালবদন বিস্তার করিয়া পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—আমার হস্ত ধরিয়া না চলিলে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করে? তাই বলি, আমার হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।

আমি বিশ্বাস; দুঃখ আমার নিকট আসিবামাত্র কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া সুখের আকার ধারণ করে—শোক আমার নিকট আসিলে তাহা অমৃতময় শ্লোক হইয়া যায়—অহঙ্কার আমার নিকট "সোহং" হইয়া আমার অন্তরের অনন্ত জ্যোতির সহিত মিশিয়া পড়ে—এবং নিরাশার অন্ধকার মহাযোগীর

গাম্ভীর্য্যের ছায়া হইয়া চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে। আমার সুগন্ধি নিঃশ্বাস-সমীরণের কোমল স্পর্শে বিষও অমৃত হয়—মৃত্তিকা মুক্তার আকার ধারণ করে। যিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়া চলিতেছেন,—তিনিই ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছেন। হে লক্ষ্যচ্যুত ভ্রান্ত নর, আর পথ না ভুলিয়া আমার হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।

আমার হাত ধরিয়া না চলিলে তোমার নিস্তার কই? পরিত্রাণ কই? শান্তি কই? সূর্য্যের সুশুভ্র আলোকেও তোমায় অন্ধকার দেখিতে হইবে—যদি আমার দিকে না চাহিয়া সংসার পথে অগ্রসর হইতে চাও! এই পার্থিব সংসারে যাঁহার কোন অভাবই নাই—বাহ্যচক্ষে দেখিতে গেলে যাঁহার অভাবের বিষয় খুজিয়া পাওয়া যায় না—যাঁহার গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র পরিজন বিদ্যমান—বিলাসের সামগ্রী যাঁহার গৃহে স্তরে স্তরে সজ্জিত, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জান দেখি, আমার অবর্ত্তমানতায় তাঁহার অন্তর বিদগ্ধ হইতেছে কি না? দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ান থাকিলেও তাঁহার সুনিদ্রা হয় কি না?

আবার যিনি দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে প্রপীড়িত—পার্থিব প্রত্যেক সুখের বস্তু হইতে বঞ্চিত—তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে আমার প্রভা অঙ্কিত থাকায় তিনি কেমন অনাবিল অতুল সুখ উপভোগ করিতেছেন। আমার হস্ত ধরিয়াই তিনি নিঃস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছেন। আমার বলেই তিনিই বুঝিয়াছেন—"মাটির দেহ মাটিতে মিশাইবে—কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার সুখই প্রকৃত সুখ—বাহ্য-বিলাস-সম্পত্তিতে আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে না; তাই তিনি আত্মার বাঞ্ছিত বস্তু লাভে প্রধাবিত হইতেছেন।

এস, এস, দুঃখী হও, পাপী হও, এখনও আমার হাত ধরিয়া চলিতে চেষ্টা কর—অমৃতময় পথের পথিক হইতে তৎপর হও।"

বিশ্বাসের আশ্বাস বাণী।

(২)

এই সংসার বড় ভয়াবহ পরীক্ষার স্থান। এই সংসার রূপ মহাসাগর পার হইতে হইলে 'বিশ্বাস'কে মানস-তরীর কর্ণধার না করিলে পার হইবার উপায় নাই। আমিই সত্যের পাল তুলিয়া দিয়া অশেষ তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত সমুদ্রের মধ্যে—প্রবল ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাত ব্যাহত করিয়া সাগরগর্ভ-নিহিত পথের প্রকাণ্ড বিঘ্ন স্বরূপ পর্ব্বত সমূহ অতিক্রম করিয়া সেই শান্তিপ্রদ—নীরব আনন্দের আধার ও পুণ্য-ময় পুলক ভরা বেলাভূমিতে লইয়া যাইব। যে দেশের পবিত্র সুখ, পার্থিব সুখে উন্মত্ত জীব উপলব্ধি করিতে পারে না—যে দেশে হাহাকারের প্রবল প্রতাপ নাই—বিষাদের কুহেলিকাময়ী অস্পষ্ট ছায়া নাই—যে দেশে ঘৃণ্য অত্যাচার, অবি-চার, উৎপীড়ন, দ্বেষ, হিংসা—ভালবাসার নাম ধারিণী কপটতা নাই, যে দেশে প্রেমের নামে কাম বিক্রয় হয় না, যে দেশে অনন্ত জ্যোতির

অতুল প্রভা সততই উদ্ভাসিত—সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরে—সেই দ্যুতিমান দেব-দেব মহাদেবের অমৃত-ময় আগারে আমি তোমায় লইয়া যাইব—এস, আমার সঙ্গে সঙ্গে এস !!!

রাজার পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব বিমাতার তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, আমার উপর নির্ভর করিয়া, আমার হস্ত ধারণ করিয়াই মায়ের কথায় আস্থা রাখিয়া "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিতে বলিতে ছুটিয়াছিলেন। হিংস্রজন্তু সমাকুল গভীর বনমধ্যে ধ্রুব একা; তাঁহার শিশু-হৃদয়ে অন্য চিন্তা নাই—কাতর ক্রন্দনে গভীর আর্ত্তনাদে তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন,—"কোথায় পদ্মপলাশ-লোচন!"

মা বলিয়াছেন তিনিই আমাদের একজন—তিনিই আমাদের বন্ধু—তিনিই আমাদের সকল দুঃখ—সকল অভাব দূর করেন; তাই মায়ের কথা শুনিয়া তিনি আতুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি!"

মায়ের কথায় ধ্রুব-বিশ্বাস করিয়া শিশু ধ্রুব আমার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রহিলেন, তাঁহার সকল ভয় দূর হইল, গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত

হইয়া এ ছার মাটির রাজ্য তুচ্ছ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণময় সিংহাসনে চলিয়া গেলেন। "বিশ্বাস"ই সেই মহারাজ্যের চালক, এই জ্ঞানে ধ্রুব নিজ কর্ত্তব্য সিদ্ধ করিলেন; তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল—জীবন সার্থক হইল।

তার পর প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর জগদীশ্বরের উপর। পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে ভূতলে পাতিত হইতেছেন—তখনও তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই, জ্বলন্ত হুতাশনে বিক্ষোভিত হইতেছেন, তখনও প্রহ্লাদের প্রাণের মধ্যে বিশ্বাস জড়িত। প্রহ্লাদ বিশ্বাসময় হইয়া গিয়াছেন, তাই ভাব-নিমগ্ন প্রহ্লাদ পিতার প্রতি বলিলেন,—"জড় স্ফটিক স্তম্ভে আমার হরি আছেন বই কি!"

অবিশ্বাসী মোহাচ্ছন্ন জীব, আমার প্রতি প্রহ্লাদের দৃঢ়তা দেখিলে? এই দৃঢ়তায় তিনি হরি-বিদ্বেষী পিতাকে দেখাইলেন,—"স্ফটিক স্তম্ভে নৃসিংহ মূর্ত্তি।"

তাই বলিতেছি বিশ্বাসের পথ বড়ই সরল—বড়ই সোজা। আমার হাত ধরিয়া এস—যদি

সেই প্রাণারাম হরিকে দেখিয়া জীবন মধুময় করিবে, প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হইবে ?

আমার বলেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের ন্যায় সারথি পাইয়াছিলেন। এস ভাই,--তাই বলি আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চল—মানব দেহে দেবতার ধর্ম্ম পাইয়া মহাদেবের প্রিয়তম হইবে।

বিশ্বাস আমাদিগকে আশ্বাস বাণী দ্বারা কেমন মধুর রবে আহ্বান করিতেছেন ; কিন্তু হায় ! আমরা কি মোহকূপে নিমগ্ন যে কূপ মণ্ডূকের ন্যায় মাটির সংসারকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার মধুময় বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। অহো ! ভ্রান্ত মানব আমরা--আমাদিগকে ধিক্ !!

প্রীতি-নিকেতন।

কোলাহলময় সংসারের তাপে মানব-হৃদয় সন্তাপিত। মানব 'শান্তি' 'শান্তি' করিয়া আকুল। শান্তির জন্য মানব আত্মহারা। কিন্তু কি উপায়ে

প্রাণে শান্তি আইসে—কি উপায়ে হৃদয় প্রীতির পুণ্য-নিকেতন হয়, কি উপায়ে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারাযায়, এ বিষয় কয়জন চিন্তা করিয়া থাকে এবং কয়জনই বা সেই বিমল 'শান্তি' লাভের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়?

মানুষ এক দিকে দেবতা, অপর দিকে রাক্ষস। এই মানুষই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। আবার এই মানুষই মনুষ্য চর্ম্মাবৃত পশু সদৃশ অতি ঘৃণ্য, অতি হেয় এবং অতি নিকৃষ্ট জীব। মানুষের হৃদয় একদিকে পবিত্র কানন, অন্যদিকে এই মানুষের হৃদয়ই ধূ ধূ ময় মরুস্থান।

তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তোমার স্থূলদেহের অভ্যন্তরে পবিত্র আত্মা চিৎশক্তি যেমন বিরাজ করিতেছেন, আমারও তদ্রূপ। তোমার আত্মা বিস্ফুরিত ও বিকশিত, তুমি হয় ত দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পাইতেছ, কারণ অন্তর্জগতের সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার মোহমালিন্যের আবরণ খানি ভেদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমি চিরঅন্ধ, মোহে আচ্ছন্ন, আমার হৃদয়ে যে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আত্মা রহিয়াছেন, ভ্রম বশতঃ আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি না অথবা দেখিতে ও

জানিতে পারিলেও, বাহ্য শোভা সন্দর্শনে আত্মার অমর প্রভাব ভুলিয়া গিয়াছি।

বাহ্য-সৌন্দর্য্য প্রলোভনকারী এবং আপাত-মনোরম বটে; কিন্তু তাহা বিনশ্বর। ক্ষণে ক্ষণে যাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী এবং পরিণামে সুফলপ্রদ নহে।

অদ্য যাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি, অদ্য যে স্ত্রী পুত্রের সুধাধবলিত মুখকমল দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি, দুই দিন পরে হয়ত কালের কুটিল স্রোতে তাহারা অনন্তে মিশিয়া যাইবে। তখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, তখন আমি দেখিব ঘোর অন্ধকার, তখন ভাবিব "কে আমার—আমি কার"?

যিনি প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, তাঁহাকে ভুলিয়া, যাহাদিগকে আপনার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছিলাম, তাঁহারা অলক্ষ্যে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইলে আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গতুফান বহিবে, তাহা আমি বর্ত্তমানের ক্ষণিকসুখে মত্ত হইয়া অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমার কি ভ্রান্তি—আমার কি মোহ!!

তখন, যে হৃদয়কে আমার প্রীতি-নিকেতন

বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল, তাহাই শ্মশান সম বোধ হইবে। সেই প্রেতপুরীর পৈশাচিক দৃশ্য ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সংসারে থাকিয়া নিত্য দেখিতে পাই, আমার স্বার্থে একটু ব্যাঘাত ঘটিলে, সংসারে একটু কিছুর অভাব বা ত্রুটি হইলে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। পরশ্রী-কাতরতা, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তি সমূহ আমার হৃদয়ে আসিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। স্ত্রী পুত্র ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি সুখের উপাদান নিচয় থাকিলেও আমার শান্তি কই? বাসনার অন্ত কই? তবে কেমন করিয়া বলিব আমার হৃদয় প্রীতি-নিকেতন।

তবে 'প্রীতি-নিকেতন' কোথায়? শান্তির চির প্রবহমান স্রোত কোথায় প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় প্রীতির বিমল উচ্ছ্বাস ছুটিতেছে? আপাত-মধুর সুখের জন্য দেখিতে পাই, সকলেই লালায়িত, কিন্তু বিমলা শান্তির ভিখারী এ জগতে কয়জন আছে? শান্তি লাভের জন্য লালায়িত ও আকুল হইলে শান্তিময় তাহার উপায় বিধান করিয়া দেন। সাধারণ মানবগণ নীচ আত্মসুখে উন্মত্ত হইয়া ত সে স্বর্গীয় সুখের জন্য লালায়িত

হয় না। তাই তাহাদিগকে কখনও পার্থিব সুখে একেবারে নিমজ্জিত এবং কখনও বা অপার দুঃখে একেবারে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে, তাই ক্বচিৎ সুখ—ক্বচিৎ দুঃখ—ক্বচিৎ আলো—ক্বচিৎ অন্ধকার দেখিয়া—কখনও বা আশার কোমল স্পর্শে আশ্বস্ত এবং কখনও বা নিরাশার কঠোর পীড়নে প্রপীড়িত ও বিধ্বস্ত হইয়া হাহাকার করিতে হয়।

বিশ্বাসীর হৃদয় কিন্তু অচল ও অটল পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়। তাঁহার হৃদয় নির্ভীক এবং সহিষ্ণুতার আধার। জগতের শোক দুঃখ তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না। তাঁহারই হৃদয় পবিত্র প্রীতি-নিকেতন। কুপ্রবৃত্তিরূপ দুরন্ত পাপ পিশাচগণ তাঁহার নিকট আসিবা মাত্র তিনি তীক্ষ্ণ মনোবল দ্বারা তাহাদিগকে দূরে বিতাড়িত করেন; তাঁহার খরধার শাণিত অস্ত্রের সন্নিধানে পাপ-পিশাচ যাইতে প্রায়ই সাহস পায় না। বিশ্বাসী জানেন, "ঈশ্বরের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তিনি এসংসারে প্রেরিত হইয়াছেন"—বিশ্বাসী জানেন, মঙ্গলময় যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য।

বিশ্বাসী জানেন, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। তাঁহার নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের

বিশাল ইচ্ছা তরুর একটী শাখা মাত্র, তাঁহার ক্ষুদ্র ইচ্ছা জগদীশ্বরের বিপুলতাময়ী ইচ্ছার সহিত সংযোজিত। মূলে বারি সিঞ্চিত হইলে, শাখাও সতেজ ও বর্দ্ধিত হইবে, বিশ্বাসী ইহা জানেন এবং বুঝেন। তাই বিশ্বাসীর নির্ভর কেবল ইচ্ছাময়ের উপর। বিশ্বাসীর চক্ষে সুখ ও দুঃখ সমান। চারি দিকে দুঃখ আসিয়া বিশ্বাসীকে টলাইবার চেষ্টা করিতেছে—বিশ্বাসী তখন বলিতেছেন—

"God, thy will be done"

"তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে" প্রাণের অভ্যন্তরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির স্রোত বহিতেছে, সংসারের ভীষণ শোক ও নৈরাশ্য বিশ্বাসীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিশ্বাসী তখন আনন্দে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছেন—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

কয়েকটা দয়ার পাত্র মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্তজীব মাটির দেহে প্রেক বিদ্ধ করিতেছে, মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াও বিশ্বাসী তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন—

"Father, forgive them, for they do not know what they do."

অর্থাৎ হে দেব, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, ইহারা যে কি কুকর্ম্ম করিতেছে, তাহার মর্ম্ম বুঝিতেছে না—পিতঃ, ইহাদিকে ক্ষমা করুন।

এই ত বিশ্বাসীর হৃদয়! কি তেজস্বী—কি বলবান—কি নির্ভীক হৃদয়!!! এই হৃদয়ই প্রীতির, প্রেমের এবং শান্তির পুণ্যময় নিকেতন। শান্তি—

বিপদে শিক্ষা।

"And men are better shew'd what is amisse,
By the expert finger of calamitie.
Than they can be with all that fortune brings
Who never shows them the true face of things.

এজগতে নিরবচ্ছিন্ন বিপদশূন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। মানব মাত্রেরই সকল সময়ে না হউক, সময় বিশেষে কোন না কোন বিপদ আছেই আছে। শিশু হইতে বালক, বালক হইতে যুবা, যুবা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই জীবনের মধ্যে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বিপদে পড়িতে চাহে না, বিপদের চিন্তাও ভয়ঙ্কর।

যদি সংসারে সকলকেই বিপদে পড়িয়েত হয় অথচ উহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে, তবে মঙ্গলময় বিধাতা এরূপ জিনীসের সৃষ্টি করিলেন কেন? যিনি কমল গড়িয়াছেন তিনি কণ্টক রাখিয়াছেন কেন? যিনি অনন্ত আলোকাধার তাঁহার রাজ্যে বিভীষিকাময়ী অন্ধকার ছায়া কিসের জন্য? যাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি রাজ্যে সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া বিমোহিত হই, তাঁহারই রাজ্যে সে সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে সময়ে সময়ে কঠোরতা ও ভীষণতা দেখা যায় কেন? এরহস্য—এ প্রহেলিকা বুঝা আয়াস-সাধ্য সন্দেহ নাই।

আলোকের পাশে আঁধার না থাকিলে, সুখের সহিত দুঃখ বিজড়িত না হইলে বুঝি আলোকের অধিকতর প্রভা প্রকটিত হয় না, সুখের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ ঘটেনা, তাই এক দিকে দুঃখ, পর পার্শ্বে সুখ, এক দিকে আলোক, অপর দিকে অন্ধকার। সম্পদের পার্শ্বেই তাই বিপদ অধিষ্ঠিত!!

সম্পদে সকল মানবের পূর্ণ শিক্ষা হয় না, হৃদয় গঠিত হয় না, তাই হৃদয় গঠনের জন্য মানবকে উন্নত পথে ধাবিত করিবার জন্য বিপদের প্রয়োজন। তবে বিপদে যে সকলেইর হৃদয়

গঠিত হয়, সকলেই যে সংযত ভাব শিক্ষা করেন তাঁহা নহে। বিপদের নাম শুনিলে যাঁহারা আকুল হন, বিপদ আসিলে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বিপদ কালে তাঁহাদের শিক্ষালাভ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা অবনতির গভীরতম কূপে নিমজ্জিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

বিপদে যাঁহারা অধীর, বিপদ সহ যুদ্ধ করিতে যাঁহারা অনিচ্ছু অথবা অক্ষম, তাঁহাদের মানসিক শক্তি দুর্ব্বল এবং প্রকৃতই তাঁহারা সুপুরুষ নহেন। আর যাঁহারা সহস্র বিপদেও অটল পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়, বিপদ আসিলে যাঁহারা পশ্চাৎ-পদ না হইয়া তৎসহ যুদ্ধ করিবার জন্য অসঙ্কুচিত, তাঁহারাই বীর পুরুষ; বিপদের বল তাঁহাদের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই সকল বীর পুরুষ বিপদের মধ্যে অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

জগদীশ্বর সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা মঙ্গলময়। তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তু আমাদের অতৃপ্তিকর হইলেও অপকারজনক নহে, তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ কদাচই আমাদের অমঙ্গলকর নহে। সময়ে সময়ে আমরা যে তাঁহার প্রণালীকে দূষিত জ্ঞান এবং তাঁহার সৃষ্ট

গুরুভক্তি।

"ভক্তি আর ভক্ত গুরু আর ভগবান। এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভান॥ যাঁর পদ-বন্দনাতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে। সাধ্য সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে॥" এই কথা কয়েকটী ভক্তি শাস্ত্রের; গুরু, ভক্ত, ভক্তি আর ভগবান একই পদার্থ; প্রকৃত গুরুভক্তিই, সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি। এ ভক্তি—এ নিষ্ঠা বিশ্বাসের এইরূপ দৃঢ়তা সাধারণ মানুষের হয় না; এ ভক্তি লাভ করিতে হইলে পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি থাকা চাই। ভক্তিধন বড় সহজ ধন নহে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তুমি একটী পয়সা উপার্জ্জন কর—কত অধ্যবসায়—কত যত্ন চেষ্টা গুণে—কত লোককে ফাঁকি দিয়া তুমি পার্থিব ধনরত্নের অধিকারী হইতেছ—কিন্তু স্বর্গের এ অতুল সম্পত্তি—এ দেব-দুর্ল্লভ ধন লাভ করিতে হইলে কিরূপ সাধনার প্রয়োজন, ভাব দেখি!! এই পরম কাম্য পদার্থ ভক্তিধন লাভ করিতে পারিলে জীবের পার্থিব ধন

লাভের বাসনা বিদূরিত হয়—মানবহৃদয় প্রকৃত সুখের ও বিমলা শান্তির পুণ্য-নিকেতন হইয়া থাকে। গুরুর প্রতি কিরূপ ভক্তি—কিরূপ নিষ্ঠা থাকিলে গুরু কিরূপ ভাবে আমাদিগকে কি ফল প্রদান করেন, তাহা দেখাইবার জন্য বৈষ্ণবের হৃদয়ভূষণ ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে আমরা পাঠকবর্গকে একটী আখ্যানমালা উপহার দিতেছি।

গঙ্গাতীরে অনেকগুলি বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর প্রতি এরূপ নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। গুরু যখনই স্থানান্তরে যাইতেন তখন শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। একদা শিষ্যকে রাখিয়া গুরু কোন স্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শিষ্য বলিলেন "গুরুদেব, আপনার বিচ্ছেদে আমি এ কুটীরে কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" গুরুদেব বলিলেন "তুমি আমার স্বরূপ ভাবিয়া—এই জাহ্নবী দেবীর সেবা কর। জাহ্নবীর সেবা করিলেই আমার সেবা করা হইবে।" গুরুর আজ্ঞা অনুসারে শিষ্য তাহাই করিতে লাগিলেন। গুরু যত দিন স্থানান্তরে থাকিলেন, শিষ্য জাহ্নবীকে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে তত

দিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি এতাবৎ কাল গঙ্গার জলে স্নান করিতেন না—অথবা ভ্রম-ক্রমেও তাহাতে পাদস্পর্শ করিতেন না। উহার জল কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইত। শিষ্যের এইরূপ কার্য্য দেখিয়া তাঁহার সহযোগী শিষ্যগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এক জল পান এক জলে স্নান—এক জলে অন্য কার্য্য সাধন—এ কিরূপ ব্যাপার এই বলিয়া তাহারা গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি নানা উপহাসপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করিল। শিষ্যের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না; শিষ্য এক মনে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে গঙ্গাদেবীর সেবা কার্য্যে রত থাকিলেন। কিছুদিন পরে গুরু গৃহে আসিলেন; সর্ব্বজ্ঞ গুরুর কোন কার্য্য জানিতে বাকী রহিল না। সহযোগী শিষ্য-গণকে উচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি এক কৌশল বিস্তার করিলেন। গুরু গঙ্গা স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; আকণ্ঠপূর্ণ জলে অগ্রসর হইলেন; অতঃপর সেই গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকে গাত্র মার্জ্জনী লইয়া আপনার নিকট আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। শিষ্য বড় সঙ্কটে পড়ি-লেন—আজ তিনি গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিবেন কিরূপে? গুরুর আদেশই বা পালন করিবেন কি

প্রকারে ? এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শিষ্য বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া নিজ গুরু আজ্ঞা বলবতী জানিয়া জলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জলস্পর্শ করিতেই কি চমৎকার দৃশ্য দেখিলেন ?—

"গুরু গঙ্গা-কৃপা বলে দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে তথা দেয় পদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেই স্থানে পদতলে কমল ফুটয়॥

কি আশ্চর্য্য ! ! গুরু কৃপাবলে শিষ্যের নিষ্ঠাগুণে গঙ্গার জল, তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করিল না ; পদ্মোপরি পাদ স্থাপন করিয়া তিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া সেইরূপ ভাবেই ফিরিয়া আসিলেন। যে সকল সহযোগী শিষ্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রকৃত নিষ্ঠাবান গুরুভক্ত শিষ্যকে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া মোহিত এবং পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য সকলেই অনুতপ্ত হইল।

পাঠক; উপরোক্ত আখ্যানটীতে বিশ্বাস করিবেন কি ? বিশ্বাস না করিবার কারণ কিছুই নাই। ভক্তির দাস ভগবান। ভক্তিতে না হয় এমন অসাধ্য কার্য্য জগতে কি আছে ? ভক্তির জোরেই

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথি করিতে পারিয়াছিলেন—ভক্তির বলেই গুহক, চণ্ডাল হইয়াও নর-নারায়ণ মনোভিরাম রামের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ওই দেখ ভক্তিবলে কুষ্ঠগ্রস্তের কুষ্ঠ দূর হইল—ভগবান ভক্তের ভক্তিগুণে সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর। বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই!!

বিশ্বাস।

"বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর" ইহা একটী মহাবাক্য। বিশ্বাস দ্বারা হরিপাদপদ্ম লাভ যেরূপ সহজ-সাধ্য হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বাস ব্যতীত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার—সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই বিশ্বাস কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? শিশুর মন যেরূপ সরল—শিশুর বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ়, তদ্রূপ সরল মন ও দৃঢ় বিশ্বাস হইলে ভগবৎ-চরণ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

ওই দেখ পথের ধারে একটী গোবৎস তৃণ ভক্ষণ করিতেছে; একটী শিশু উক্ত পথ দিয়া

যাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু যাইতে যাইতে পরক্ষণেই ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে। "গোবৎস তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না—তুমি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাও" এই কথাটী বলিবা মাত্র শিশু আমার কথায় ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল; আমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে শিশু গোবৎসের ভয়ে হয় ত, পথ দিয়া যাইতেই পারিত না। এই রূপ বিশ্বাসই প্রার্থনীয়, আর এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কার সাধ্য, হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে?

এই দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্রে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান আছে। আমরা তদ্বিষয়ে অদ্য আলোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব এবং আমাদের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্তের সন্দেহ উহাতেও যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদূরিত হয় বা বিদূরিত হইবার পথ প্রাপ্ত হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব! উপাখ্যানটী এই :—

"নিরাই গ্রামে এক চোর বাস করিত। চৌর্য্য-বৃত্তিই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এক দিন সে হাজার টাকার একটী থলি চুরি করিল। এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে মহা

হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ চোর ছিল, হাকিম একে একে সকলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চোর এই কার্য্য দেখিয়া অতি ভীত হইল—সে ভাবিল—"আমার রক্ষার কোন উপায় নাই—ধরা পড়িলে ত আমার প্রাণ থাকিবে না!" বলা বাহুল্য, সে কালে চৌর্য্য অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত।

যে সময় চোর এইরূপ বিষম চিন্তায় আকুল, সেই সময়ে উক্ত গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে পুরাণ পাঠ হইতেছিল। চোর ইতঃপূর্ব্বে কখনও পুরাণ পাঠ শুনে নাই। আজ কি ভাবিয়া সে পুরাণের কথা শুনিতে গেল। সে তথায় গিয়া এই কয়েকটী কথা শুনিল—

"কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ মাত্র হয় পুনর্জ্জন্ম।
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম॥
দ্বিজ শব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
গায়ত্রী দীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥

কথা কয়েকটী শুনিয়াই সে গৃহে গেল এবং ভাবিতে লাগিল—"আমি ত নিশ্চয় চুরি করিয়াছি—আমার পরীক্ষাও ত হইবে—নিশ্চয় আমি চোর বলিয়া ধরা পড়িব; কিন্তু পুরাণে যে কথা শুনিলাম

তাহা মিথ্যা হইবার নহে। এ সময় দীক্ষা গ্রহণ করিলে ত আমার কোন বিপদ থাকিবে না—দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আমি অবশ্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব—তবে আমার আর ভয় কি, ভাবনা কি?" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সে এক বৈষ্ণবের নিকট সেই দিনেই মন্ত্র গ্রহণ করিল।

পরদিন গোয়েন্দা আসিয়া তাহাকে হাকিমের নিকট লইয়া চলিল। চোর হাকিমের নিকট গিয়াই সরলভাবে বলিল—"মহাশয়, আমি চুরি করি নাই—ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমার কঠোর পরীক্ষা করিতে পারেন।" হাকিম তদনুসারে এক খানি উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড আনাইয়া তাহাকে লইতে বলিলেন। চোরের দৃঢ় বিশ্বাস যে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে তাহার সমস্ত পাপও ভস্মীভূত হইয়াছে। তাই সে দৃঢ়তার সহিত বলিল—"পাপ করিয়া থাকিলে অবশ্যই উত্তপ্ত লৌহে আমার অঙ্গ দগ্ধ হইবে।"

তখন চোর সেই অগ্নিবৎ লৌহ গ্রহণ করিল কিন্তু কই তাহার কোন স্থানই দগ্ধ হইল না। বিশ্বাসের বলে সে দৃঢ়চিত্ত; নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে

সে এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। হাকিম চোরকে প্রকৃত সাধু জানিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গোয়েন্দার প্রাণ লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

চোর তখন আর চোর নহে; দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সে এখন সাধু হইয়াছে। গোয়েন্দার প্রাণ যায় দেখিয়া সে করযোড়ে বলিল—

"মহারাজ উঁহার অপরাধ কিছু নাই।
মিথ্যা না কহিল, সত্য চুরি কৈনু মুঁই॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্বজন্মেতে করিনু।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় না কৈনু॥"

ভঃ মাঃ

কথা শুনিয়াই সকলে চমৎকৃত হইল; চোরের অদ্ভুত বিশ্বাসের বিষয় জানিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমরাও বলি—

"গুরু কৃপা বলে মন্ত্রে সেই ত তস্কর।
ভাগবতোত্তম হইল কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"

ধন্য, ধন্য! সাধু, সাধু! আমাদেরও এইরূপ বিশ্বাস হইবে কি?

স্বর্গের ছবি।

(১)

(নিঃস্বার্থ মাতৃ-স্নেহ ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃ-ভাব।

স্নেহময়ী জননী, আত্মসুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য, হাস্যমুখে কেমন করিয়া রণে পাঠাইতে পারেন, তাহা যাঁহারা রাজপুতনার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন। এরূপ বীরা জননীর কথা হিন্দুর দেশে, হিন্দুর গ্রন্থে, রাজপুতের জাতীয় ইতিহাসে প্রচুর রহিয়াছে। আবার জগতের শ্রেষ্ঠ ধন ভক্তি-তত্ত্ব লাভ করাইবার জন্য স্নেহময়ী জননী বার্দ্ধক্যের অবলম্বন স্বরূপ পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন, এ বিষয় অন্য দেশের লোকের কল্পনার বিষয়ীভূত না হইলেও হিন্দুর দেশে অসম্ভব নহে।

জ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও দেখ হিন্দুর দেশে, কর্ম্মের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে মানস করিয়াছ—হিন্দুর নিকট অনুসন্ধান কর;—ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত আদর্শ দেখিতে ইচ্ছা থাকে, অনন্ত রত্নের আকর স্বরূপ হিন্দুর পবিত্র ভক্তিশাস্ত্র

আলোচনা কর। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর শাস্ত্রে যাহার আদর্শ নাই—জগতের কোন স্থানে তাহা নাই অথবা থাকিতে পারে না।

সন্তানকে পরম ধন লাভ করাইবার জন্য জননীর স্বার্থত্যাগের ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃভাবের কথা এস পাঠক, আজ আমরা পবিত্র বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ভক্তিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হই। আখ্যানটী এইরূপ—

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মন্দালসা। রাণী মন্দালসার ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। ভগবৎভক্তিই মানবের একমাত্র কাম্য পদার্থ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তদনুসারে তিনি এই পরম ধন লাভ করাইবার জন্য আপনার চারিটী পুত্রকে অতি শৈশব অবস্থায় কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাণী অন্তঃপুরে থাকিয়া যে এ কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজা তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি জানিতেন পুত্রগুলি তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাজা পুত্রশোকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন।

কিছুদিন পরে আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

রাজা এই পুত্রটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন এবং অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই তাহার সংবাদ লইতে লাগিলেন; রাণীর কৌশল এবার ব্যর্থ হইল। দেখিতে দেখিতে পুত্রটীর অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। পুত্রের জন্ম লগ্ন অতি শুভ জানিয়া, তিনি তাহার নাম "ধনেশ" রাখিতে চাহিলেন, রাণী তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন স্বামিন্, পুত্রের ঐশ্বর্য্যের জন্য আপনি ব্যাকুল কেন—ধনে কি হয়—কেবল অভিমান বৃদ্ধি হয় মাত্র, উহা অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তি-রত্ন উৎকৃষ্ট নহে কি? আমি বলি পুত্রের নাম "ধনেশ" না রাখিয়া "হরিদাস" রাখাই ন্যায়সঙ্গত।

কথায় কথায় রাজা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন তাঁহার অপর পুত্র চতুষ্টয়ের মৃত্যু হয় নাই—রাণীর কৌশলেই তাহারা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? তাহাদিগকে লাভ করিবার আর কোন উপায় নাই। যাহা হউক, রাজা রাণীকে বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে—অপর পুত্রগুলির অবস্থা ত বুঝিলাম, কিন্তু আর কেন? এ পুত্রটীকে বনে পাঠাইলে চলিবে না। এই পুত্রটী আমাদের সমস্ত আশা ভরসা স্থল—এবং আমার বিশাল

গুরুভক্তি।

"ভক্তি আর ভক্ত গুরু আর ভগবান। এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভান॥ যাঁর পদ বন্দনাতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে। সাধ্য সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে॥" এই কথা কয়েকটী ভক্তি শাস্ত্রের; গুরু, ভক্ত, ভক্তি আর ভগবান একই পদার্থ; প্রকৃত গুরুভক্তিই, সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি। এ ভক্তি—এ নিষ্ঠা বিশ্বাসের এইরূপ দৃঢ়তা সাধারণ মানুষের হয় না; এ ভক্তি লাভ করিতে হইলে পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি থাকা চাই। ভক্তিধন বড় সহজ ধন নহে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তুমি একটী পয়সা উপার্জ্জন কর—কত অধ্যবসায়—কত যত্ন চেষ্টা গুণে—কত লোককে ফাঁকি দিয়া তুমি পার্থিব ধনরত্নের অধিকারী হইতেছ—কিন্তু স্বর্গের এ অতুল সম্পত্তি—এ দেব-দুর্লভ ধন লাভ করিতে হইলে কিরূপ সাধনার প্রয়োজন, ভাব দেখি! এই পরম কাম্য পদার্থ ভক্তিধন লাভ করিতে পারিলে জীবের পার্থিব ধন

লাভের বাসনা বিদূরিত হয়—মানবহৃদয় প্রকৃত সুখের ও বিমলা শান্তির পুণ্য-নিকেতন হইয়া থাকে। গুরুর প্রতি কিরূপ ভক্তি—কিরূপ নিষ্ঠা থাকিলে গুরু কিরূপ ভাবে আমাদিগকে কি ফল প্রদান করেন, তাহা দেখাইবার জন্য বৈষ্ণবের হৃদয়ভূষণ ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে আমরা পাঠকবর্গকে একটী আখ্যানমালা উপহার দিতেছি।

গঙ্গাতীরে অনেকগুলি বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর প্রতি এরূপ নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। গুরু যখনই স্থানান্তরে যাইতেন তখন শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। একদা শিষ্যকে রাখিয়া গুরু কোন স্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শিষ্য বলিলেন গুরুদেব, আপনার বিচ্ছেদে আমি এ কুটীরে কিরূপে জীবন ধারণ করিব?” গুরুদেব বলিলেন “তুমি আমার স্বরূপ ভাবিয়া—এই জাহ্নবী দেবীর সেবা কর। জাহ্নবীর সেবা করিলেই আমার সেবা করা হইবে।” গুরুর আজ্ঞা অনুসারে শিষ্য তাহাই করিতে লাগিলেন। গুরু যত দিন স্থানান্তরে থাকিলেন, শিষ্য জাহ্নবীকে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে তত

দিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি এতাবৎ কাল গঙ্গার জলে স্নান করিতেন না—অথবা ভ্রমঃ ক্রমেও তাহাতে পাদস্পর্শ করিতেন না। উহার জল কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইত। শিষ্যের এইরূপ কার্য্য দেখিয়া তাঁহার সহযোগী শিষ্যগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এক জল পান এক জলে স্নান—এক জলে অন্য কার্য্য সাধন—এ কিরূপ ব্যাপার এই বলিয়া তাহারা গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি নানা উপহাসপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করিল। শিষ্যের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না; শিষ্য এক মনে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে গঙ্গাদেবীর সেবা কার্য্যে রত থাকিলেন। কিছুদিন পরে গুরু গৃহে আসিলেন; সর্ব্বজ্ঞ গুরুর কোন কার্য্য জানিতে বাকী রহিল না। সহযোগী শিষ্যগণকে উচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি এক কৌশল বিস্তার করিলেন। গুরু গঙ্গা স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; আকণ্ঠপূর্ণ জলে অগ্রসর হইলেন; অতঃপর সেই গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকে গাত্র মার্জ্জনী লইয়া আপনার নিকট আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। শিষ্য বড় সঙ্কটে পড়িলেন—আজ তিনি গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিবেন কিরূপে? গুরুর আদেশই বা পালন করিবেন কি

প্রকারে ? এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শিষ্য বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া নিজ গুরু আজ্ঞা বলবতী জানিয়া জলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জলস্পর্শ করিতেই কি চমৎকার দৃশ্য দেখিলেন ?—

"গুরু গঙ্গা-কৃপা বলে দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেই স্থানে পদতলে কমল ফুটয়॥

কি আশ্চর্য্য ! ! গুরু কৃপাবলে শিষ্যের নিষ্ঠাগুণে গঙ্গার জল, তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করিল না ; পদ্মোপরি পাদ স্থাপন করিয়া তিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া সেইরূপ ভাবেই ফিরিয়া আসিলেন। যে সকল সহযোগী শিষ্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রকৃত নিষ্ঠাবান গুরুভক্ত শিষ্যকে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া মোহিত এবং পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য সকলেই অনুতপ্ত হইল।

পাঠক, উপরোক্ত আখ্যানটীতে বিশ্বাস করি-বেন কি ? বিশ্বাস না করিবার কারণ কিছুই নাই। ভক্তির দাস ভগবান। ভক্তিতে না হয় এমন অসাধ্য কার্য্য জগতে কি আছে ? ভক্তির জোরেই

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথি করিতে পারিয়াছিলেন—ভক্তির বলেই গুহক, চণ্ডাল হইয়াও নর-নারায়ণ মনোভিরাম রামের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ওই দেখ ভক্তিবলে কুষ্ঠগ্রস্তের কুষ্ঠ দূর হইল—ভগবান ভক্তের ভক্তিগুণে সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর। বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই!!

বিশ্বাস।

"বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর" ইহা একটী মহাবাক্য। বিশ্বাস দ্বারা হরিপাদপদ্ম লাভ যেরূপ সহজ-সাধ্য হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বাস ব্যতীত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার—সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই বিশ্বাস কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? শিশুর মন যেরূপ সরল—শিশুর বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ়, তদ্রূপ সরল মন ও দৃঢ় বিশ্বাস হইলে ভগবৎ-চরণ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

ওই দেখ পথের ধারে একটী গোবৎস তৃণ ভক্ষণ করিতেছে; একটী শিশু উক্ত পথ দিয়া

যাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু যাইতে যাইতে পরক্ষণেই ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে। "গোবৎস তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না—তুমি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাও" এই কথাটী বলিবা মাত্র শিশু আমার কথায় ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল; আমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে শিশু গোবৎসের ভয়ে হয় ত, পথ দিয়া যাইতেই পারিত না। এই রূপ বিশ্বাসই প্রার্থনীয়, আর এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কার সাধ্য, হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে?

এই দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্রে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান আছে। আমরা তদ্বিষয়ে অদ্য আলোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব এবং আমাদের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্তের সন্দেহ উহাতেও যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদূরিত হয় বা বিদূরিত হইবার পথ প্রাপ্ত হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। উপাখ্যানটী এই :—

"নিরাই গ্রামে এক চোর বাস করিত। চৌর্য্য-বৃত্তি তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এক দিন সে হাজার টাকার একটা থলি চুরি করিল। এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে মহা

হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রামের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ চোর ছিল, হাকিম একে একে সকলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চোর এই কার্য্য দেখিয়া অতি ভীত হইল—সে ভাবিল—"আমার রক্ষার কোন উপায় নাই—ধরা পড়িলে ত আমার প্রাণ থাকিবে না!" বলা বাহুল্য, সে কালে চৌর্য্য অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত।

যে সময় চোর এইরূপ বিষম চিন্তায় আকুল, সেই সময়ে উক্ত গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে পুরাণ পাঠ হইতেছিল। চোর ইতঃপূর্ব্বে কখনও পুরাণ পাঠ শুনে নাই। আজ কি ভাবিয়া সে পুরাণের কথা শুনিতে গেল। সে তথায় গিয়া এই কয়েকটী কথা শুনিল—

"কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ মাত্র হয় পুনর্জ্জন্ম।
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম॥
দ্বিজ শব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
গায়ত্রী দীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥"

কথা কয়েকটী শুনিয়াই সে গৃহে গেল এবং ভাবিতে লাগিল—"আমি ত নিশ্চয় চুরি করিয়াছি—আমার পরীক্ষাও ত হইবে—নিশ্চয় আমি চোর বলিয়া ধরা পড়িব; কিন্তু পুরাণে যে কথা শুনিলাম

তাহা মিথ্যা হইবার নহে। এ সময় দীক্ষা গ্রহণ করিলে ত আমার কোন বিপদ থাকিবে না—দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আমি অবশ্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব—তবে আমার আর ভয় কি, ভাবনা কি?" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সে এক বৈষ্ণবের নিকট সেই দিনেই মন্ত্র গ্রহণ করিল।

পরদিন গোয়েন্দা আসিয়া তাহাকে হাকিমের নিকট লইয়া চলিল। চোর হাকিমের নিকট গিয়াই সরলভাবে বলিল—"মহাশয়, আমি চুরি করি নাই—ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমার কঠোর পরীক্ষা করিতে পারেন।" হাকিম তদনুসারে একখানি উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ড আনাইয়া তাহাকে লইতে বলিলেন। চোরের দৃঢ় বিশ্বাস যে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে তাহার সমস্ত পাপও ভস্মীভূত হইয়াছে। তাই সে দৃঢ়তার সহিত বলিল—"পাপ করিয়া থাকিলে অবশ্যই উত্তপ্ত লৌহে আমার অঙ্গ দগ্ধ হইবে।"

তখন চোর সেই অগ্নিবৎ লৌহ গ্রহণ করিল কিন্তু কই তাহার কোন স্থানই দগ্ধ হইল না। বিশ্বাসের বলে সে দৃঢ়চিত্ত; নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে

সে এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। হাকিম চোরকে প্রকৃত সাধু জানিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গোয়েন্দার প্রাণ লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

চোর তখন আর চোর নহে; দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সে এখন সাধু হইয়াছে। গোয়েন্দার প্রাণ যায় দেখিয়া সে করযোড়ে বলিল—

"মহারাজ উহার অপরাধ কিছু নাই।
মিথ্যা না কহিল, সত্য চুরি কৈনু মুই॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্বজন্মেতে করিনু।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় না কৈনু॥"

ভঃ মাঃ

কথা শুনিয়াই সকলে চমৎকৃত হইল; চোরের অদ্ভুত বিশ্বাসের বিষয় জানিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমরাও বলি—

"গুরু কৃপা বলে মন্ত্রে সেই ত তস্কর।
ভাগবতোত্তম হইল কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"

ধন্য, ধন্য! সাধু, সাধু! আমাদেরও এইরূপ বিশ্বাস হইবে কি?

স্বর্গের ছবি।

(১)

(নিঃস্বার্থ মাতৃ-স্নেহ ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃ-ভাব।

স্নেহময়ী জননী, আত্মসুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য, হাস্যমুখে কেমন করিয়া রণে পাঠাইতে পারেন, তাহা যাঁহারা রাজপুতনার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন। এরূপ বীরা জননীর কথা হিন্দুর দেশে, হিন্দুর গ্রন্থে, রাজপুতের জাতীয় ইতিহাসে প্রচুর রহিয়াছে। আবার জগতের শ্রেষ্ঠ ধন ভক্তি-তত্ত্ব লাভ করাইবার জন্য স্নেহময়ী জননী বার্দ্ধক্যের অবলম্বন স্বরূপ পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন, এ বিষয় অন্য দেশের লোকের কল্পনার বিষয়ীভূত না হইলেও হিন্দুর দেশে অসম্ভব নহে।

জ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও দেখ হিন্দুর দেশে, কর্ম্মের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে মানস করিয়াছ—হিন্দুর নিকট অনুসন্ধান কর;—ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত আদর্শ দেখিতে ইচ্ছা থাকে, অনন্ত রত্নের আকর স্বরূপ হিন্দুর পবিত্র ভক্তিশাস্ত্র

আলোচনা কর। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর শাস্ত্রে যাহার আদর্শ নাই—জগতের কোন স্থানে তাহা নাই অথবা থাকিতে পারে না।

সন্তানকে পরম ধন লাভ করাইবার জন্য জননীর স্বার্থত্যাগের ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃভাবের কথা এস পাঠক, আজ আমরা পবিত্র বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ভক্তিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হই। আখ্যানটী এইরূপ—

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মন্দালসা। রাণী মন্দালসার ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। ভগবৎভক্তিই মানবের একমাত্র কাম্য পদার্থ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তদনুসারে তিনি এই পরম ধন লাভ করাইবার জন্য আপনার চারিটী পুত্রকে অতি শৈশব অবস্থায় কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাণী অন্তঃপুরে থাকিয়া যে এ কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজা তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি জানিতেন পুত্রগুলি তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাজা পুত্রশোকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন।

কিছুদিন পরে আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

রাজা এই পুত্রটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন এবং অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই তাহার সংবাদ লইতে লাগিলেন; রাণীর কৌশল এবার ব্যর্থ হইল। দেখিতে দেখিতে পুত্রটীর অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। পুত্রের জন্ম লগ্ন অতি শুভ জানিয়া, তিনি তাহার নাম "ধনেশ" রাখিতে চাহিলেন, রাণী তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন স্বামিন্, পুত্রের ঐশ্বর্য্যের জন্য আপনি ব্যাকুল কেন—ধনে কি হয়—কেবল অভিমান বৃদ্ধি হয় মাত্র, উহা অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তি-রত্ন উৎকৃষ্ট নহে কি? আমি বলি পুত্রের নাম "ধনেশ" না রাখিয়া "হরিদাস" রাখাই ন্যায়সঙ্গত।

কথায় কথায় রাজা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; বুঝিলেন তাঁহার অপর পুত্র চতুষ্টয়ের মৃত্যু হয় নাই—রাণীর কৌশলেই তাহারা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? তাহাদিগকে লাভ করিবার আর কোন উপায় নাই। যাহা হউক, রাজা রাণীকে বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে—অপর পুত্রগুলির অবস্থা ত বুঝিলাম, কিন্তু আর কেন? এ পুত্রটীকে বনে পাঠাইলে চলিবে না। এই পুত্রটী আমাদের সমস্ত আশা ভরসা স্থল—এবং আমার বিশাল

রাজ্যের উত্তরাধিকারী ; এপুত্র গৃহে থাকিয়া আমাদের প্রীতি উৎপাদন করুক।”

রাণী স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অদ্ভুত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু পুত্র যে ভক্তিধনের অধিকারী হইতে পারিল না, তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ রহিলেন এবং পুত্রেরও নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিয়া তাহার নাম ‘অলর্ক’ রাখিলেন।

যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইল : রাণীর দুঃখ কিন্তু কিছুতেই ঘুচিল না। অবশেষে রাণী একখানি ভক্তিপত্র লিখিয়া, এক সোণার কৌটার ভিতর বন্ধ করিয়া পুত্রকে দিয়া বলিলেন “বাপ্, স্বর্ণের কৌটা তোমার নিকট রাখিয়া দাও— সংসারে যদি কখনও কোন ঘোর বিপদে পতিত হও, তবে উহা খুলিয়া দেখিলেই বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে—অপর সময় উহা কদাপি খুলিও না।” পুত্র মাতার আদেশ অনুসারে যত্নের সহিত স্বর্ণপুট রাখিয়া দিল।

কিছুকাল পরে, রাজা ও রাণী উভয়েরই মৃত্যু হইল ; অলর্ক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। মন্দালসার অপর পুত্র চতুষ্টয় এই সংবাদ অবগত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরম ধনের অধিকারী

না হইয়া, বিষয়-কূপে নিমগ্ন থাকিল দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা চারিজনে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে কনিষ্ঠের রাজসিংহাসনে কোন অধিকার থাকিতে পারে না, এই বলিয়া সকলেই অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অলর্ক মহাবিপদাপন্ন হইলেন; তখন তাঁহার মায়ের কথা মনে পড়িল; তিনি মাতৃদত্ত সেই স্বর্ণকৌটা উন্মোচন করিয়া দেখিলেন—

"শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি তাহে তাৎপর্য্য অর্থ।
ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ব্যর্থ॥"

—পাঠ করিবার পরই অলর্কের মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে বিবেক-সূর্য্য উদিত হইল; বিষয়ের বিঘোর মায়া বিদূরিত হইল—তিনি বলিলেন, কৃষ্ণ-ভক্তিই সার রত্ন—অপর সকলই ক্ষণস্থায়ী; স্বর্গীয় অবিনশ্বর সামগ্রী জগতে যদি কিছু থাকে, তবে উহা ভগবত-ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

স্বর্ণপুটের অন্তর্গত পত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভ্রাতাগণও তাঁহার মনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কনিষ্ঠকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এস ভাই, আমরা সংসারত্যাগী ফকীর—রাজ্য লাভ করিতে আমরা আসি নাই—তোমাকেও আমাদের সাথী করিবার জন্য আসিয়াছি—এস ভাই, আমাদের সঙ্গে এস। এ ছার তুচ্ছ ধন পরিত্যাগ করিয়া সেই দারিদ্র্যভঞ্জন নিধির পদানুসরণ করি, এস।"

ভাই ভাই শুভ সম্মিলন হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য অর্পণ করিয়া সকলেই মহাপথের পথিক হইলেন। পাঠক! উপরি উক্ত আখ্যান পাঠে কি লাভ হইল? প্রাণের মধ্যে যে ভীষণ বাসনানল তোমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছে—বিষয়কে পরম ধন জ্ঞান করিয়া তুমি যে মহামোহে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছ—সেই তীব্র বাসনার—সেই বিঘোর মোহের কিয়দংশও হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অপসৃত হইবে কি?

সে কি ধন ?

জগতে এমন কি ধন আছে, যাহা পাইলে আর কোন ধন পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না ? যে ধন পাইলে জীবন প্রীতির পবিত্র নিলয় হইতে পারে ? যে ধনের অধিকারী হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না—মানুষ মানবদেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেব-দুর্লভ সুধা পান করিয়া চরিতার্থ হয়। কি সে ধন ? বুঝিতে চেষ্টা করিলে যাহাকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না—জানিতে চাহিলে যাহার এক অঙ্গ জানিলেও হৃদয়, মন ও প্রাণ প্রেমে গদ গদ হইয়া উঠে, সে ধন কি, ভাই বলিতে পার ?

যে অপার্থিব ধন প্রাপ্ত হইলে স্পর্শমণিকেও ঠেলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়—পৃথিবীর রাশি রাশি রত্ন, মাণিক্য, হীরক, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা যে ধনের সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ তৃণবৎ বলিয়া বোধ হয়, সে ধন কি ? যে মহাত্মা এই ধনের অধিকারী, তিনিই বলিতে পারেন—বুঝিতে পারেন বুঝাইতে পারেন এ ধন—এ অতুল ধন—ত্রিদিব হইতে আনীত এ মহারত্ন কি ?

বল ভাই, সে ধন কি? যাহা পাইবার লালসা হইলে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বন গমনেও সঙ্কোচ ও আতঙ্ক থাকে না। বল সেই ধন কি? যাহার অংশমাত্র লাভ করিলেও—ভক্তি-প্রিয় মাধব, বাঁধা পড়িয়া থাকেন। যাহার কণিকা হস্তগত করিতে পারিলে—ভক্তাধীন ভগবান দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকেন?

যাহার অধিকারী হইলে, দারিদ্র্যভঞ্জন হরি দরিদ্রের ঘরে তণ্ডুলকণা সাদরে গ্রহণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যাহার অধিকারী হইলে শত দিবস গম্য পথ অতিক্রম করিয়া দয়াময় হরি বিপ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর হন। সে ধন কি? যাহা বা যাহার এক অঙ্গ লাভ করিলে চণ্ডাল হইলেও ভগবান তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া চরিতার্থ করেন।

সে ধন কি? যে ধনের অধিকারী হওয়ায়, প্রহ্লাদের দেহ হুতাশনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও দগ্ধ হয় না—পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পাতিত এবং হস্তী কর্ত্তৃক পদদলিত হইলেও কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় না, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেও দেহ নষ্ট হইয়া যায় না।

সে ধন কি? যে ধনের অধিকারী হইলে মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়—যে ধনাধিকারীর চরণরেণু স্পর্শে মহাব্যাধি দূর হইয়া যায়। সে ধন কি? যে ধনের অধিকারী হইয়া পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ডাকিলেই হরি স্থির থাকিতে না পারিয়া বিশ্বাসীর মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করেন!

সে ধন কি? সে ধন আর কিছুই নহে—সে ধন ভক্তিরূপ পরম ধন—ঈশ্বরে ভক্তি—হরিভক্তি বা কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। এই ভক্তি ধনের কথা জানিতে হইলে বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে—সাধুসঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবৎ কৃপা ও ঐকান্তিকী লালসা না হইলে এ ধনের এক অংশও লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত সুখ, পবিত্র আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। যে হৃদয়ে এই ভক্তি দেবী বিরাজমানা—সেই হৃদয়ই মাধুর্য্যময় শ্রীহরির নিত্য লীলানিকেতন; ভগবান স্বয়ং ভক্ত নারদকে কি বলিতেছেন, শুনুন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগী[illegible] ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি ত[illegible]॥"

এ হেন দুর্লভ রত্নের অধিকারী যাঁহারা তাঁহারা চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠ মানব অথবা মানবদেহে দেবতা। তাঁহাদের সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তেরা শূদ্র নহেন। তাঁহারা ভাগবতোত্তম বলিয়া গণনীয়।

"সুরাণাং আরাধনাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ তদীয়ানাং সমর্চ্চনং পূজনং পরতরং স্যাৎ॥"

বিষ্ণুর আরাধনাই নিখিল দেবগণের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তদপেক্ষা আবার ভক্তবর্গের পূজা শ্রেষ্ঠ জানিবে। স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"

অভক্ত ব্রাহ্মণ আমার প্রিয়পাত্র নহে; ভক্ত চণ্ডালও আমার অতি প্রিয়; সুতরাং নীচকুলজাত হইলেও সেই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তাহার দানই আমার একান্ত গ্রাহ্য। অতএব আমারই ন্যায় আমার ভক্তের পূজা প্রশস্ত জানিবে।

"মদ্ভক্তঃ পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গ চেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং ॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব! মদীয় সেবায় আস্থা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, মদ্বিষয়ে মনের ও বাক্যের চেষ্টা, আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ, যাবতীয় বাসনা ত্যাগ সমস্তই বৃথা। মদীয় ভক্তগণের পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহাই আমার অনুমোদিত।"

ভগবান ভক্তের জন্য, ভক্তের সম্মান রক্ষার জন্য, কখনই সঙ্কুচিত নহেন। তাহার জীবন্ত উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রের প্রতিপত্রে, প্রতিছত্রে রহিয়াছে। আমাদের ন্যায় বিষয়বিমূঢ় লোকের সে সকলের সম্যক আলোচনা অসাধ্য ও অধিকার-বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। তবে ভগবানের নিকট ভক্তই একমাত্র প্রিয়তম এবং ভক্তি ভিন্ন সার ধন জগতে আর কিছুই নাই, ইহা দেখাইবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি মাত্র।

ভক্তি রসাশ্রয়ীর সুখ কিরূপ? নারদ বলিয়াছেন "মূকাস্বাদনবৎ" যিনি এ মধুপান করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। উত্তর দিবেন কি—তিনি দেবের দুর্লভ সুধাপানে বিভোর হইয়া

আত্মভোলা হইয়া নীরব হইয়াছেন। তাঁহার নিকট উত্তর কি পাইব? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করার ন্যায় আমাদেরও এ দুরাশা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন সাধক কবিগণ ভক্তি শব্দের কি পরিচয় দিতেছেন সংক্ষেপে তাহার বিষয় বলিতেছি। ভক্তির স্থান কত উচ্চে, তৎসম্বন্ধে ভগবান নিজে বলিয়াছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব! যোগ বল, স্বাধ্যায় বল, ত্যাগ বল, জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল আর তপস্যাই বল, কিছুতেই আমাকে সহজে লাভ করিতে পারা যায় না। ভক্ত-গণ ভক্তি দ্বারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন! বৈষ্ণব কবি চুড়ামণি কৃষ্ণদাস বলেন—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগল স্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥"

আবার স্থানান্তরে—

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্ম লয়॥

ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥"

সাধক কবি নাভাজী ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এইরূপ—ভক্তি মহারাণীর সেবা করিতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে অতি যত্নে হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া দাও। শ্রদ্ধারূপ সুগন্ধি তৈলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন কর, শ্রবণ উদ্বর্ত্তনে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মলা ছুটাইয়া এবং মনন নীরে স্নান করাইয়া দয়ারূপ গাত্র মার্জ্জনী-দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দাও। তৎপরে নিষ্ঠা সুবস্ত্র পরিধান করাইয়া হরিসেবা রূপ আভরণ—সাধু-সেবার কর্ণফুল ও স্মরণ সুনথ দিয়া ভূষিত কর। অতঃপর সৎসঙ্গের অঞ্জন লাগাইয়া অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রীতি সাধন কর।

ভক্তির অঙ্গ নয়টী। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, এবং আত্ম-নিবেদন। এই নব অঙ্গের এক অঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও মায়াবন্ধন ত্যাগ করিয়া পরম ধাম লাভ করিতে পারা যায়। শ্রবণ যোগে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণ সেবা দ্বারা কমলা, অর্চ্চনা দ্বারা পৃথুরাজা, বন্দনে অক্রূর, শুদ্ধ

দাস্যরূপে কপীশ্বর, সখ্য দ্বারা অর্জ্জুন এবং আত্ম-নিবেদন দ্বারা বলি, শ্রীহরির রাতুলচরণ প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন।

সে ধন কি? পাঠক, তাহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বুঝিলেন কি? ঐ দেখুন এই মহারত্নের ভিখারী হইয়া স্বয়ং মহাপ্রভু কি কামনা করিতেছেন—

ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনি ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আবার সাধক কবি প্রেমিক গোবিন্দ দাস গোবিন্দচরণ প্রয়াসী হইয়া প্রাণের মহা আবেগে কোকিলকণ্ঠে মধুর তানে ভক্তিরস পরিপূরিত কি সুন্দর নীতি গান করিতেছেন শুনুন, শ্রবণ করিয়াও কর্ণ পরিতৃপ্ত হউক।

"ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয়চরণার বিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভব সিন্ধুরে॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগি॥
এরূপ যৌবন ধন জন ইথে কি আছে পরতীত
কমল জল দল জীবন টলমল সেবহ হরিপদ নিত॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, দাস্যরে।
পূজন, সখিগুণ, আত্ম-নিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষরে॥

দাস গোবিন্দের যে মহদভিলাষ, আমাদেরও সংসার বাসনা ঘুচিয়া সেই অভিলাষ হইবে কি ?

বিশাল সমুদ্রগর্ভ হইতে অঞ্জলি পরিমিত বারিসংগ্রহের ন্যায় ভক্তির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল, এ ক্ষুদ্র আলোচনায় কাহারও বিশেষ তৃপ্তি হইবে, বোধ হয় না। পিপাসার্ত্ত যাঁহারা, তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র রূপ বিশাল বারিধির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পিপাসা দূর করুন।

সম্পূর্ণ।